গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন কমিশন

ই-মেইল :info@lc.gov.bd
web :www.lc.gov.bd

একাদশ জাতীয় সংসদের আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ২৯.০৮.২০২৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখের ৩২ তম বৈঠক-এ উপস্থাপনের নিমিত্ত

‘‘ মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি ও মামলার জট হ্রাসকরণে আইন কমিশন এর সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন ’’

১৫ কলেজ রোড, ঢাকা-১০০০

বর্তমানে বাংলাদেশে বিদ্যমান বিভিন্ন আইনি জটিলতা ও নানারকম পারিপার্শ্বিক কারণে মামলা নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রিতা ও মামলা জট সমস্যা উদ্বেগজনকভাবে জটিল আকার ধারণ করেছে যা জনগনকে তাদের ন্যায়বিচার লাভের সাংবিধানিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে। বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থায় এ মামলা জট একদিনে বা এক বছরে হয়নি। বহু বছরের পুঞ্জীভূত সমস্যা বর্ধিত হয়ে বর্তমানে এই অসহনীয় পরিস্থিতিতে পৌঁছেছে। ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান স্বাধীন রাষ্ট্র সৃষ্টির সময় তদানীন্তন পূর্ববঙ্গ হতে বহু সংখ্যক বিচারক ভারতে অপশন দিয়ে চলে যান। ফলে অন্যান্য সার্ভিসের ন্যায় বিচার বিভাগেও বিচারক শূন্যতা দেখা দেয়। সংকট এমন পর্যায়ে ছিল যে, নিম্ন আদালতে অনেক জেলায় জেলা জজের স্থলে একজন মুন্সেফ দায়িত্ব পালন করতে বাধ্য হন। জরুরী ভিত্তিতে বিচারক নিয়োগের পদক্ষেপ গ্রহণ করে তখনকার সমস্যা কিছুটা দূরীভূত করা সম্ভব হয়েছিল । তখন যদিও শুধুমাত্র মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে বিচারক নিয়োগ হয়েছিল তথাপি বিচারকদের গুণাবলী ও যোগ্যতার ব্যাপারে কোন আপোষ করা হয়নি। এই সকল নতুন বিচারকরাই তদানিন্তন বিচার ব্যবস্থার বুনিয়াদ সাফল্যজনকভাবে বিনির্মাণ করেন।

ইতোমধ্যে ১৯৫০ সালের East Bengal State Acquisition and Tenancy Act এর আওতায় জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত হয়। সে কারণে উচ্চ আদালত ও জেলা আদালতসমূহে বহু নুতন মামলা দায়ের হতে থাকে। এর মধ্যে ১৯৫৬ সনে নতুন করে এস.এ. খতিয়ান প্রণয়নের কাজ শুরু হলে ভূমির মালিকানা ও দখল সংক্রান্ত অনেক নতুন বিরোধ দেখা দেয় ও মামলা দায়ের হতে থাকে। এ সব অতিরিক্ত মামলার চাপ তদানিন্তন অল্প সংখ্যক বিচারকদেরকেই বহন করতে হয়। এতে অবশ্যম্ভাবীরূপে মামলা জট বৃদ্ধি পেতে থাকে।

ইতোমধ্যে ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধ আরম্ভ হলে The Enemy Property (Custodian and Registration) Order, 1965 এবং The East Pakistan Enemy Property (Land and Building) Administration and Disposal Order, 1966, এর আওতায় বিভিন্ন সম্পত্তির মালিকানাকে কেন্দ্র করে বহু মোকদ্দমা দায়ের হতে থাকে।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় আবার নতুন করে বৈরী পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। দেড় কোটি শরণার্থী তাদের ঘর-বাড়ী, সহায়-সম্পত্তি পরিত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। মুক্তিযুদ্ধ শেষে শরণার্থীরা স্বাধীন দেশে প্রত্যাবর্তন করলেও অনেকেই তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি বেদখল দেখতে পান। ফলে নতুন অনেক দেওয়ানি ও ফৌজদারি মোকদ্দমার উদ্ভব হতে থাকে। ইতোমধ্যে ১৯৭৬ সালে রিভিশনাল সেটেলমেন্ট কার্যক্রম গ্রহণ করা

হলে সেখানেও নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়, যার শেষ গন্তব্য হয় আদালত। তাছাড়া স্বাধীনতা প্রাপ্ত নতুন দেশে গৃহীত উন্নয়নমূলক কার্যাদির কারণেও বিভিন্ন প্রকৃতির নতুন ধরণের মামলা বিচার বিভাগের সামনে আসতে থাকে।

১৯৪৭ সাল হতে এভাবে দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার সংখ্যা বহু গুণ বৃদ্ধি পেলেও বিচারকের সংখ্যা অন্যান্য চাকুরির তুলনায় তেমনভাবে বৃদ্ধি পায়নি। ফলে মামলার সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

আদালতের সেরেস্তাদার বা নাজির, পেশকার, পিওন সামান্য কর্মচারী হলেও তারাও বিচার বিভাগের সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং বিচারকার্য ঠিকভাবে পরিচালনার জন্য তাদেরও ভূমিকা রয়েছে। তাদের সঙ্গে স্থানীয় আইনজীবী, বাসিন্দা ও বিচারপ্রার্থী জনগণের সাথে সরাসরি যোগাযোগের কারণে অনেক ক্ষেত্রে নৈতিক স্খলনসহ নানারূপ সমস্যা পুঞ্জীভূত হতে থাকে। ফলশ্রুতিতে বিচারক ও ম্যাজিস্ট্রেটের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হতে থাকে এবং অন্তিমে ন্যায়বিচার শুধু বিলম্বিত নয় অনেক ক্ষেত্রে ব্যাহত হতে থাকে।

বাংলাদেশের সংবিধান বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ হতে পৃথক ও স্বাধীন সত্ত্বা হিসাবে থাকবে বলে ঘোষণা দিলেও কার্যক্ষেত্রে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সোনার হরিণ হয়েই থাকে। তাছাড়া, এই বিভাগ, দুঃখজনক হলেও, কোন সময়ই সরকারের নিকট থেকে যথাযথ গুরুত্ব পায়নি।

তাছাড়া, গত শতকের আশির দশকের প্রারম্ভ হতে অনেক নতুন নতুন আইনের আওতায় নানা ধরনের আদালত সৃষ্টি করা হয় এবং সেই সকল নতুন আদালতের দায়িত্ব বিদ্যমান বিচারকগণকেই তাদের পূর্বের বিচারিক কার্যের অতিরিক্ত হিসেবে পালন করতে হয়। গত এক দশকে কিছু কিছু পদ সৃষ্টি হলেও তা প্রকৃত চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। ফলে বিচার কার্যের এই বাড়তি চাপ সামাল দেয়া সম্ভব হয় না। যার ফলে একদিকে স্তুপীভূত মামলার পরিমাণ বাড়তে থাকে, অন্যদিকে একই বিচারককে নিজস্ব আদালতের বাহিরেও অনেক সময় একাধিক আদালতে বিভিন্ন ধরণের মামলা নিষ্পত্তি করতে গিয়ে হিমশিম খেতে হয়। অন্তিমে অনেক ক্ষেত্রেই ন্যায় বিচার ব্যাহত হতে থাকে; বিচার বিভাগের উপর সাধারণ জনগণের আস্থা কমতে থাকে এবং অবশ্যম্ভাবীরূপে আপীল ও রিভিশনের সংখ্যাও বাড়তে থাকে।

এভাবে ধীরে ধীরে উপর্যুক্ত কারণাধীনে বিভিন্ন ধরনের মামলার সংখ্যা জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে, যার প্রভাব বাংলাদেশের সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ এবং হাইকোর্ট বিভাগেও পড়ে, উক্ত সমস্যা নিম্নোক্ত পরিসংখ্যানদ্বয় হতে প্রতীয়মান হয়।

২০০৮-২০২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের মামলার পরিসংখ্যান :

সন	দায়ের	নিষ্পত্তি	বিচারাধীন	বিচারকের সংখ্যা
২০০৮	৫০৪১	৫২২০	৬৮৯২	৭
২০০৯	৪৪০৩	৬০৩৫	৫২৬০	১১
২০১০	৫৪৬৪	১৫৮৩	৯১৪১	৮
২০১১	৪৭৪৯	১৪৪৯	১২৪৪১	১০
২০১২	৬০৩৬	১৮৩০	১৬৬৪৭	৭
২০১৩	৫৯৮৯	৮২৯৮	১৪৩৩৮	১০
২০১৪	৬৯১৯	৫৯১১	১৫৩৪৬	৯
২০১৫	৮০০৭	৯৯৯২	১৩৩৬১	৮
২০১৬	৯৯৪৫	৯৬৩৪	১৩৬৭২	৯
২০১৭	১১৪৮৪	৮৫৯১	১৬৫৬৫	৯
২০১৮	১০৫৭২	৬৬৯৫	২০৪৪২	৭
২০১৯	৯৪৭৮	৬৩০৩	২৩৬১৭	৭
২০২০	৬৯৫৮	১৫৩৫০	১৫২২৫	৯
২০২১	৭৮০৬	৬৮৫৯	১৬১৭২	৭
২০২২	৯১৬২	৫৪০৬	১৯৯২৮	৯

সূত্রঃ বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের ২০২২ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন।

২০০৮-২০২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের মামলার পরিসংখ্যান :

সন	দায়ের	নিষ্পত্তি	বিচারাধীন	বিচারকের সংখ্যা
২০০৮	৫৩২২০	২১৬৬৪	২৯৩৯০১	৬৭
২০০৯	৫৩১৫৫	২১৪৮৫	৩২৫৫৭১	৭৮
২০১০	৫৭৪৭০	৬৯৩০৬	৩১৩৭৩৫	৯৪
২০১১	৪৫০৮৪	৬৮৪২৫	২৭৯৯২৩	৯৮
২০১২	৫৬৭৩২	৩৮৪৩৭	২৯৭৭৩১	১০১
২০১৩	৫০০১০	২৪২৯৫	৩২৩৪৪৬	৯৫
২০১৪	৬০০৬৯	২২৪৭৭	৩৬১০৩৮	৯০
২০১৫	৭০৯৪০	৩৭৭৫৩	৩৯৪২২৫	৯৭

২০১৬	৭০৬৪৭	৩৯৮৭৮	৪২৪৯৯৪	৯৫
২০১৭	৮৭২৫২	৩৫৪৯৬	৪৭৬৭৫০	৮৯
২০১৮	৮৮৮০১	৪৯০৩৫	৫১৬৬৫২	৯৫
২০১৯	১০৭৫৬৮	১৩৫২৭৫	৪৮৯০৬৮	১০০
২০২০	৬৪০১৩	৩৪১৯২	৪৫২৯৬৩	৯৭
২০২১	৮৩২১৬	২৩৬৫৪	৫১২৫৭৬	৯২
২০২২	৯১৪৯৮	৮৭৪৭৪	৫১৬৬৭৪	৯৭

সূত্রঃ বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের ২০২২ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন।

বর্তমানে জেলা পর্যায়ে মামলা জটের একমাত্র কারণ না হলেও প্রধান কারণ বিচারকের সংখ্যার অপ্রতুলতা। তার সঙ্গে যোগ হয়েছে এজলাসের সঙ্কট। কিছু কিছু নতুন আদালত ভবন নির্মাণ শুরু হলেও প্রয়োজনের তুলনায় তা অপ্রতুল, ফলে এজলাস ও বিচারক সংকটের কারণে বর্তমানের প্রায় ৪০ লক্ষাধিক মামলার জট কোনভাবেই সমাধান সম্ভব নয়। বরঞ্চ মামলা নিষ্পত্তির হার ক্রমাগত বৃদ্ধি পেলেও প্রতিদিনই নতুন নতুন মামলা মোকদ্দমা দায়ের হচ্ছে ও মামলার সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা নিম্নোক্ত পরিসংখ্যান হতে স্পষ্ট।

২০০৮-২০২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতসহ অন্যান্য আদালতে মামলার পরিসংখ্যান :

সন	দায়ের	নিষ্পত্তি	বিচারাধীন
২০০৮	১০৮৭৫৫৯	৬৮৫৮০৩	১৪৮৯১২১
২০০৯	৯১৩৫৭৮	৭০০৭৬৭	১৬৪৪১৩৫
২০১০	১১৫০৪৯৩	১০২৪৯৭৮	১৭০৩৬৩৬
২০১১	১০৩৭৪৯২	৮৮১৮১৪	১৮৪৫৮৮৬
২০১২	১২৮৬৬৮৮	৯৮৩২৪৬	২১৩৫৪৪৯
২০১৩	১৪৪৯৪৭৬	১০৯০১৫১	২৪০৯৬৭১
২০১৪	১৫৩৭৯৯১	১২৭৪৫২৫	২৬৩০৫২১
২০১৫	১৪৬৮৫১৭	১৩৭৮৭২৯	২৭০১৫৪৬
২০১৬	১৩২৪৮৮৫	১২৮৪৩৩৬	২৭১৮২১২
২০১৭	১৬৪৭৪৫৩	১০৯৯২০৬	২৮৬১১৮৫
২০১৮	১৬৯৫৩০৫	৯৮৮১৩৫	৩০৩২৬৫৬

২০১৯	১৭৬৩২৬৭	১০২৪৩৫৭	৩১৭২০৪৩
২০২০	১৩৮২৫৬৮	৬৯০০২১	৩৪৬৪৯৯৮
২০২১	১৭০৩৮৫৫	৮৮১৩৩৯	৩৬৭৪৭৬৮
২০২২	২১৩৩৫৪৪	১৩৭৮৫২২	৩৬৬০০০১

সূত্রঃ বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের ১ জানুয়ারি ২০২২ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশের মামলার পরিসংখ্যানমূলক প্রতিবেদন।

উপরিউক্ত ছক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ হতে ২০২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রতি বছরে বছরে মামলার সংখ্যা বেড়েই চলেছে এমনকি গত ১৫ বছরে তা দ্বিগুণেরও বেশী হয়েছে। এই অস্বাভাবিক মামলা জট নিরসনের ব্যাপারে ত্বরিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হলে বিচার ব্যবস্থার উপর সাধারণ মানুষের শুধু আস্থাই হারিয়ে যাবে না বরং বিচার ব্যবস্থাই ভেঙে পড়বার উপক্রম হবে।

আইন কমিশন সুদীর্ঘ গবেষণাক্রমে বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থায় মামলাজট বা মামলার দীর্ঘসূত্রিতার কারণ অনুসন্ধানপূর্বক যে সকল সুপারিশ এ যাবতকাল প্রদান করেছে তা নিম্নে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো :

দেওয়ানি ও ফৌজদারি উভয় মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ঃ

১। <u>অপ্রতুল সংখ্যক বিচারক ঃ</u>

সমগ্র বিশ্বের বিচার ব্যবস্থার তুলনামূলক বিশ্লেষণ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বাংলাদেশে বিচারকের অনুপাত বিদ্যমান মামলার খুবই স্বল্প। বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের ১ জানুয়ারি ২০২২ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশের মামলার পরিসংখ্যানমূলক প্রতিবেদন অনুযায়ী গত বছর ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশের উচ্চ আদালতসহ জেলা আদালতগুলোতে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ছিল ৪১ লাখ ৯৬ হাজার ৬০৩ টি। এর মধ্যে-

ক) বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ছিল ১৯ হাজার ৯২৮ টি ;

খ) হাইকোর্ট বিভাগে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ছিল ৫ লাখ ১৬ হাজার ৬৭৪ টি ;

গ) জেলা ও দায়রা জজ আদালতসহ অন্যান্য আদালতে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ছিল ৩৬ লাখ ৬০ হাজার ১ টি।

এই বিপুল সংখ্যক মামলা পরিচালনার করার জন্য বিচারকের সংখ্যা অতি নগন্য। বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে মাননীয় বিচারপতির সংখ্যা ০৮ জন এবং হাইকোর্টে মাননীয় বিচারপতির সংখ্যা ৯০ জন। এই তথ্য অনুযায়ী, আপীল বিভাগে বিচারের জন্য বিচারক প্রতি মামলা রয়েছে ২৪৯১ টি এবং হাইকোর্ট বিভাগে বিচারক প্রতি মামলা রয়েছে ৫৭৪১ টি। অপরদিকে, জেলা ও দায়রা জজ আদালতসহ অন্যান্য আদালতে বর্তমানে বিচারকের সংখ্যা প্রায় ২০০০ জন, এর মধ্যে ডেপুটেশনে রয়েছেন আনুমানিক ২০০ জন বিচারক। সেই হিসেবে জেলা বিচার বিভাগে বিচারক প্রতি মামলা আছে ২০৩৩ টি।

অন্যদিকে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা প্রায় ১৭ কোটি। এই সংখ্যাকে বর্তমানে বাংলাদেশের জেলা ও দায়রা জজ আদালতসহ অন্যান্য আদালতে বিদ্যমান বিচারকের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে ৯৪,৪৪৪ জনের বিপরীতে বিচারকের সংখ্যা মাত্র একজন, যা বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় নিতান্তই কম। বিশ্বের অন্যান্য দেশ ও বাংলাদেশে জনসংখ্যার উপর ভিত্তি করে বিচারকের সংখ্যা নিম্নের ছকে দেখানো হল ঃ

রাষ্ট্রের নাম	বিচারকপ্রতি জনসংখ্যা
যুক্তরাজ্য	৩১৮৬ জন (আনুমানিক)
যুক্তরাষ্ট্র	১০০০০ জন (আনুমানিক)
অস্ট্রেলিয়া	২৪৩০০ জন (আনুমানিক)
ভারত	৪৭৬১৯ জন (আনুমানিক)
পাকিস্তান	৫০০০০ জন (আনুমানিক)
বাংলাদেশ	৯৪,৪৪৪ জন (আনুমানিক)

সূত্র ঃ ওয়েবসাইট

উপরিউক্ত পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট যে বাংলাদেশে মামলাজটের অন্যতম প্রধান কারণ বিচারকের স্বল্পতা।

উল্লেখ্য যে, দেশের চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতসমূহে আদালতের সংখ্যার বিপরীতে অপ্রতুল সংখ্যক ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ দেয়ার কারণে অনেক আদালত ভারপ্রাপ্ত বিচারক কর্তৃক পরিচালিত হয়ে থাকে। ফলে একজন বিচারককে তার নিজস্ব আদালতের মামলার অতিরিক্ত মামলার বিচারের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। ফলশ্রুতিতে উক্ত আদালতসমূহে বিচারাধীন বিভিন্ন ধরণের মামলাসমূহে বিচারকগণ অনেক সময়ই যথাযথ মনঃসংযোগ প্রদান করতে পারেন না ফলে স্বাভাবিকভাবেই দীর্ঘসূত্রিতা সৃষ্টি হয় এবং ন্যায়বিচার ব্যাহত হয়।

তাছাড়া যুগ্ম জেলা জজ, অতিরিক্ত জেলা জজ ও জেলা জজগণ দেওয়ানি আপীল, রিভিশন, ফৌজদারি আপীল, রিভিশন এর পাশাপাশি বিভিন্ন বিশেষ আদালত ও ট্রাইব্যুনালের বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় একজন বিচারককে বিভিন্ন প্রকারের একাধিক আদালতের মামলার বিচারকার্যে নিয়োজিত থাকতে হয়। একই বিচারকের উপরে একাধিক আদালতের দায়িত্বভার আরোপিত থাকার কারণে অনেক সময়ই কোন একটি আদালতের গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী বা শুনানী শুরু হলে অপর আদালত/ট্রাইব্যুনালসমূহের মামলা পরিচালনা করা সম্ভবপর হয় না। অনেক আদালতের বিচারক এত বেশি মামলার ভারে ভারাক্রান্ত যে তিনি যদি শুধু স্বাক্ষরও করেন তাতেও অনেক সময় ব্যয় হয়। ফলে কজ লিস্টে থাকা প্রতিদিনের সকল মামলা শুনানি করা প্রায়শই সম্ভব হয়না। এ ধরণের আদালতগুলোতে বিচারকের একান্ত সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সবার জন্য সময়মতো প্রতিকার প্রদান সম্ভব হয় না। ফলশ্রুতিতে বিচারপ্রার্থী জনগণকে হয়রানির শিকার হতে হয়। এ ধরণের অনাকাঙ্ক্ষিত হয়রানি থেকে উত্তরণের জন্য যে সমস্ত আদালতে অধিক মামলা বিচারাধীন উক্ত আদালতসমূহের উপর চাপ কমানোর জন্য প্রয়োজন অনুপাতে আরো অতিরিক্ত আদালত প্রতিষ্ঠা করে অতিরিক্ত বিচারক নিয়োগ প্রদান করা জরুরী।

সুপারিশ ঃ

(ক) মামলার জট কমাতে অতি দ্রুত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিচারক নিয়োগের উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে জরুরী ভিত্তিতে বিভিন্ন পর্যায়ে পদ সৃজন পূর্বক কমপক্ষে ৫০০০ বিচারক নিয়োগ করা হলে বর্তমান মামলার জট কমিয়ে মামলার সংখ্যা সহনীয় (Break even) পর্যায়ে আনা সম্ভব হবে। তবে রাষ্ট্রের সীমিত সক্ষমতার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে স্বল্প সময়ে এত সংখ্যক বিচারক নিয়োগ প্রদান করা সম্ভব নয় এবং অধিক সংখ্যক বিচারক একসঙ্গে নিয়োগ প্রদান করলে তাদের গুণগতমানেরও অবনতি ঘটতে পারে, তবে ধারাবাহিকভাবে প্রতিবছর কমপক্ষে ৫০০ বিচারক নিয়োগ দেওয়া প্রয়োজন। তাছাড়া, বেশীসংখ্যক বিচারক একসঙ্গে প্রশিক্ষণ দেবার সক্ষমতাও আমাদের নেই। মনে রাখতে হবে প্রশিক্ষণের ব্যাপারে কোনরূপ অবহেলা চলবে না।

(খ) অন্তর্বর্তী সমাধান হিসেবে সুপ্রীম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে বিচার বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারকদের জেলা জজদের মধ্য হতে দক্ষ, সৎ, যোগ্য কর্মকর্তাগণকে চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ ও পদায়ন করলে পুরাতন বিচারাধীন

দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার শুনানি, আপিল ও রিভিশন মামলাসমুহ দ্রুত নিষ্পত্তি করা সম্ভব হবে। এজন্য প্রয়োজনীয় বাজেট ও সাংগঠনিক কাঠামো গঠনে পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

২। বিশেষায়িত আদালতসমূহে বিচারক নিয়োগ ঃ

আইন প্রণয়নের সুতিকাগার জাতীয় সংসদ কর্তৃক আইন প্রনয়ণ করার মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিশেষায়িত আদালত সৃষ্টি করা হলেও এসব আদালতের বিচারিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নতুন করে পর্যাপ্ত সংখ্যক বিচারক নিয়োগ না দিয়ে অনেক সময় বিভিন্ন আদালতের মামলায় ইতোমধ্যে ভারাক্রান্ত বিচারকদের উপর অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে এসব বিশেষায়িত আদালত ও ট্রাইব্যুনালের মামলা পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করা হয়। যেমন: যুগ্ম জেলা জজ, অতিরিক্ত জেলা জজ ও জেলা জজগণ দেওয়ানি আপীল, রিভিশন, ফৌজদারি আপীল, রিভিশন এর পাশাপাশি বিভিন্ন বিশেষ আদালত ও ট্রাইব্যুনালের বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। ফলে মামলায় ভারাক্রান্ত সেসব বিচারকগণের পক্ষে প্রত্যাশিত সংখ্যক মামলা নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয় না।

সুপারিশঃ

এই ধরনের বিশেষায়িত আদালত/ ট্রাইব্যুনাল গঠনের সাথে সাথেই উক্ত আদালত/ ট্রাইব্যুনালসমূহে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিচারকের পদ সৃজনপূর্বক বিচারক নিয়োগ দিতে হবে।

৩। মিথ্যা, ফলহীন ও হয়রানিমূলক মামলা দায়ের ঃ

আইনের অপপ্রয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশের অধিকাংশ আদালতে মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও হয়রানিমূলক মামলা দায়ের মহামারীর আকার ধারণ করেছে। এ কারণে অনেক নিরপরাধ ব্যক্তি বিশেষ করে ফৌজদারী মামলায় বিনা কারণে কারাভোগসহ অহেতুক হয়রানি ও বহুমুখী ক্ষয়-ক্ষতির শিকার হচ্ছেন। বাংলাদেশে বিদ্যমান আইনি পরিকাঠামোতে The Penal Code, 1860 এর ধারা ২১১ ও ১৮২ এবং The Code of Criminal Procedure, 1898 এর ২৫০ ধারা তে ক্ষতিপূরণের বিধান থাকলেও তার সর্বোচ্চ পরিমান মাত্র ১০০০/- টাকা, এর অতিরিক্তভাবে আরও ৩০০০/- টাকা পর্যন্ত জরিমানার বিবরণ রয়েছে, যা বর্তমান আর্থ- সামাজিক প্রেক্ষাপট ও হয়রানির শিকার ব্যক্তির ক্ষতির পরিমাণ বিবেচনায় অত্যন্ত অপ্রতুল।

সুপারিশঃ

ক) মামলা দায়েরের প্রবেশপথেই মিথ্যা, ফলহীন ও হয়রানিমূলক মামলাগুলোকে নিরুৎসাহিত করতে হবে। নালিশী মামলা গ্রহণের ক্ষেত্রে ২০০ ধারায় ফরিয়াদীকে পরীক্ষাপূর্বক উক্ত মামলার রক্ষণীয়তার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

খ) ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হলে দায়েরকারীর বিরুদ্ধে The Penal Code, 1860 এর ২১১ ধারার আওতায় মামলা করার ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা আনয়ন করতে হবে ও দ্রুত শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। এতে মিথ্যা মামলা দায়রের প্রবণতা কমবে এবং মামলার সংখ্যা অনেকাংশে কমানো সম্ভব হবে।

গ) দেওয়ানি মোকদ্দমার ক্ষেত্রে The Code of Civil Procedure,1908 এর 35A ধারায় মিথ্যা মামলার জন্য পক্ষের আবেদনের প্রেক্ষিতে ক্ষতিপূরণ প্রদানের যে বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে,তা যথাযথভাবে পালন করতে হবে।

ঘ) দেওয়ানি মোকদ্দমা চূড়ান্ত নিষ্পত্তিঅন্তে মামলা আনয়নকারীপক্ষ মামলায় পরাস্থ হলে এবং মামলা যদি তুচ্ছ (frivolous) হয় তবে অপরপক্ষকে Cost প্রদান করতে যেন বাধ্য হয়, সে বিষয়ে The Code of Civil Procedure, 1908 এ যে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করা হয়েছে, সেটির যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

ঙ) হয়রানিমূলক মিথ্যা মামলা প্রতিরোধে প্রচলিত আইনের বিশেষ করে ক্ষতিপূরণ সংক্রান্তে The Penal Code, 1860 এবং The Code of Criminal Procedure, 1898 এর প্রয়োজনীয় সংস্কার করা অতীব জরুরী।

চ) মিথ্যা মামলা দায়েরের কারণে যেসব নিরাপরাধ ব্যক্তিকে কারাগারে আটক থাকতে হয়েছে, তাদেরকে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় আইনি পরিকাঠামো প্রণয়ন করা আবশ্যক।

৪। <u>জনবলের অভাব ঃ</u>

বিচার সংশ্লিষ্ট সহায়ক কাজে বিচারকদের সহযোগিতা করার জন্য প্রশাসনিক কর্মকর্তা, বেঞ্চ সহকারী, সেরেস্তাদার, স্টেনোগ্রাফার ও অন্যান্য কর্মচারীর সংখ্যাও প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। একজন মধ্যম পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তার তুলনায় একজন বিচারক অনেক কম জনবলের সহায়তায় বিপুল সংখ্যক মামলার বিচার নিষ্পত্তির দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এছাড়াও অনেক সময় নতুন বিচারকের পদ সৃষ্টি হলেও সহায়ক কর্মচারী ও ভৌত অবকাঠামোর অপ্রতুলতা প্রকট হয়ে দেখা দেয়।

সুপারিশ ঃ

বিচারকদের পদ সৃজনের সাথে সাথে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহায়ক কর্মচারীর পদ সৃজন ও ভৌত কাঠামোসহ আনুষাঙ্গিক সুবিধাদি নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এছাড়া উক্ত সহায়ক কর্মচারীদের নিয়োগ বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের তত্ত্বাবধানে পরিচালনা করার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় আইন সংস্কার করা প্রয়োজন।

৫। <u>দুর্বল অবকাঠামো ঃ</u>

দেশে প্রতিটি জেলা সদরে, উপজেলার বিপরীতে দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালত থাকলেও সেই হিসেবে সমসংখ্যক এজলাস নেই। যার ফলে প্রায় সব জজশীপেই একাধিক বিচারককে একই এজলাস ও খাসকামরা ভাগাভাগি করে ব্যবহার করতে হয়। একজন বিচারকের এক কর্ম দিবসের মোট কর্মঘন্টা বিভাজ্য হয়ে যায়। তাছাড়া বর্তমানে থানা বা উপজেলার সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও তার বিপরীতে সম সংখ্যক বিচারক নিয়োগ প্রদান করা হয়না। ফলে একজন বিচারককে বিভিন্ন থানা/উপজেলার মামলা শুনানি করতে হয়। যার ফলে সংশ্লিষ্ট আদালতে বিচারাধীন মামলা শুনানীতে যে সময় ব্যয় করা প্রয়োজন, তা ব্যয় করা সম্ভবপর হয় না। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে সাক্ষী উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও এজলাস সংকট ও সময়ের অভাবে সাক্ষ্য গ্রহণ সম্ভবপর হয় না।

সুপারিশ ঃ

এই পরিস্থিতির উন্নতির জন্য বিদ্যমান আদালত ভবনগুলি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অতিদ্রুত উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ বা নতুন আদালত ভবন নির্মাণ করা প্রয়োজন, অন্যথায় মামলা জট নিরসনে আনীত বিভিন্ন কার্যক্রম মুখ থুবড়ে পড়বে। এছাড়া নব-সৃজিত থানা/উপজেলার বিপরীতে উক্ত থানা/উপজেলা গঠনের সাথে সাথে সম সংখ্যক বিচারকের পদ সৃজন করতঃ দ্রুত বিচারক নিয়োগ প্রদান করতে হবে।

৬। <u>আদালতসমূহে মামলার সুষম বন্টনের অভাব ঃ</u>

জেলা জজশীপসমূহের বিভিন্ন আদালতের বিচারাধীন মামলাসমূহের পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে সমএখতিয়ার সম্পন্ন আদালতসমূহে বিচারাধীন মামলার সংখ্যার মধ্যে অনেক তারতম্য বিদ্যমান অর্থাৎ, কোন আদালতে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা বেশি, আবার কোন আদালতে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। ফলে কোন কোন বিচারক মামলার আধিক্যের কারণে আবার কোন কোন বিচারক মামলা স্বল্পতার কারণে পর্যাপ্ত সংখ্যক মামলা নিষ্পত্তি করতে পারেন না, যা মামলা নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রিতা সৃষ্টি করে।

সুপারিশ ঃ

(ক) The Code of Civil Procedure, 1908 এর ২৪ ধারা মতে জেলা জজ স্ব-প্রণোদিত হয়ে তার প্রশাসনিক ক্ষমতাবলে মামলার ভারে ভারাক্রান্ত আদালত থেকে কিছু মামলা উত্তোলন করে বিচার ও নিষ্পত্তির জন্য স্বল্প সংখ্যক মামলা যে আদালতে আছে তথায় স্থানান্তর করতে পারেন।

(খ) ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট/ চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট তার আইনানুগ ক্ষমতাবলে তার অধীনস্থ ম্যাজিস্ট্রেটদের মাঝে মামলাসমূহ সমভাবে বন্টন করতে পারেন। এছাড়াও তিনি প্রয়োজনবোধে মামলার ভারে ভারাক্রান্ত ম্যাজিস্ট্রেট আদালত হতে স্বল্প সংখ্যক মামলা আছে এমন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলা স্থানান্তর করতে পারেন।

৭। <u>প্রশাসনিক শৈথিল্য ঃ</u>

প্রায়ই পরিলক্ষিত হচ্ছে যে অকারণে বিচারবিভাগীয় গুরুত্বপূর্ণ আদালতসমূহে বিচারক নিয়োগ প্রদান অস্বাভাবিক বিলম্বিত হয়। শূণ্য আদালতে বিচার কার্যক্রম প্রকৃতপক্ষে অচল হয়ে যায়। প্রশাসনিক শৈথিল্য বিচার বিলম্বের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

সুপারিশ ঃ

অতি দ্রুততার সাথে শূণ্য আদালতে বিচারক নিয়োগ বা বদলির ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৮। <u>অপ্রতুল অর্থ বরাদ্দ ঃ</u>

বিচারকার্য সুচারুরূপে পরিচালনা করার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে কাগজ, কলম, প্রয়োজনীয় রেজিস্ট্রার, কম্পিউটার সামগ্রীসহ আনুষাঙ্গিক অনেক মনোহারী সামগ্রী অপরিহার্য। রাষ্ট্রের প্রধান তিনটি বিভাগের মধ্যে

বিচারবিভাগ অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হওয়া সত্বেও অন্যান্য বিভাগ ও সরকারী অফিস এর ন্যায় বিচার বিভাগের জন্য আনুপাতিক হারে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ কখনও প্রদান করা হয়না, ফলে অপ্রতুল অর্থ বরাদ্দের কারণে আদালতসমূহের স্বাভাবিক বিচারকার্য ব্যাহত হচ্ছে, যা মামলা জটের অন্যতম কারণ।

সুপারিশ ঃ

বিচার ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় লোকবল, অবকাঠামো ও ডিজিটাইজেসন ও আনুষাঙ্গিক সামগ্রীর জন্য বাজেটে রাষ্ট্রের অন্যান্য বিভাগগুলোর সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে বাজেট বৃদ্ধি করা আবশ্যক।

৯। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জবাবহিদিতার অভাব ঃ

উচ্চ আদালত ও জেলা পর্যায়ের আদালতসমূহের কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের কার্যকর জবাবদিহিতার অভাব থাকায় তাদের ইচ্ছাকৃত অবহেলা, অযোগ্যতা ও অদক্ষতার কারণে মামলা নিষ্পত্তিতে বিঘ্ন বা বিলম্ব ঘটে থাকে।

সুপারিশ ঃ

(ক) আদালতসমূহের কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের ইচ্ছাকৃত অবহেলা, অযোগ্যতা ও অদক্ষতা প্রমাণিত হলে গুরুতর পেশাগত অসদাচারণ বিবেচনায় তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

(খ) বিচারকগণের ACR এমনভাবে লেখা প্রয়োজন যাতে তাদের প্রকৃত মূল্যায়ন হয়। বিচারকগণের পদোন্নতি কেবল তাদের জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়, বরঞ্চ তাদের রায় ও ACR এর ভিত্তিতে হওয়া প্রয়োজন।

১০। আইনজীবীগণের আন্তরিকতার অভাব ঃ

আইনজীবীগন সমগ্র বিচার ব্যবস্থায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ধারণা করা যায় যে, সঠিক সময়ে সঠিক আইনগত পরামর্শ প্রদান করা হলে ৫০-৬০% মোকদ্দমা দায়েরই হত না। কিন্তু দুঃখজনক হলেও বর্তমানে আইনজীবীদের অসততা, অবহেলা, দূরদর্শিতার ও জবাবদিহিতার অভাব, অসহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব, সর্বোপরি আন্তরিকতার অভাবের কারণে মামলার সংখ্যা ও দীর্ঘসূত্রিতা বেড়েই চলেছে। উল্লেখ্য যে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অন্ততঃ উভয়পক্ষের আইনজীবীগণ তাদের নিজ নিজ মামলার (merit) সম্পর্কে অবহিত থাকেন।

সুপারিশ ঃ

দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলাসমূহের ক্ষেত্রে অন্তত সরকারি কৌশুলীদের জবাবদিহিতার আওতায় নিয়ে আসতে হবে।

এছাড়া বিজ্ঞ আইনজীবীগণের নিকট হতে যে সকল পদক্ষেপ আশা করা যেতে পারে তা নিম্নরূপ ;

দেওয়ানি মোকদ্দমার ক্ষেত্রে ঃ

ক) মোকদ্দমা দায়েরের সময় আরজি সঠিকভাবে প্রস্তুত করা এবং সকল বাদি ও বিবাদীগণের নাম ঠিকানা সঠিকভাবে লেখা। তাছাড়া চূড়ান্ত নোটিশ, সমন, খামে নাম ঠিকানা ইত্যাদি সঠিকভাবে লেখা।

খ) মামলার মুলতবীর দরখাস্তসহ অন্যান্য অহেতুক আবেদনপত্র দাখিল নিরুৎসাহিত করা।

গ) সকল আইনি পদক্ষেপ যথাসময়ে গ্রহণ করা।

ঘ) মোকদ্দমা, রিভিশন, আপীল ইত্যাদি দায়েরের ব্যাপারে যথাযথ আইনী পরামর্শ প্রদান করা।

ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে ঃ

ক) আসামীকে সঠিক আইনি পরামর্শ প্রদান করা।

খ) সঠিক ও সুনির্দিষ্টভাবে আইনের আওতায় থেকে তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনে আইনি সহায়তা প্রদান করা।

অন্যান্য ক্ষেত্রে ঃ

ক) মক্কেলকে অহেতুক frivolous ও তুচ্ছ মামলা/মোকদ্দমা করতে নিরুৎসাহিত করা।

খ) যে কোন মোকদ্দমা গ্রহণ করার পূর্বে এর মেরিট (merit) সম্বন্ধে একটা আইনগত মতামত প্রদান করা।

১১। <u>দুর্বল মামলা ব্যবস্থাপনা ঃ</u>

দেশের আদালতসমূহে মামলা দায়ের হতে শুরু করে মামলা নিষ্পত্তি পর্যন্ত আদর্শ মামলা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Case Management System) অনুসরণ না করায় পদ্ধতিগত ত্রুটির কারণেও মামলার জট বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সুপারিশ ঃ

আদালতের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রতিটি আদালতের জন্য একটি আদর্শ মামলা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রস্তুতপূর্বক তা অনুসরণ করার নির্দেশনা দেওয়া যেতে পারে। আপাতত: CRO এবং CrRO strictly ও meticulously অনুসরণ করবার নির্দেশনা জরুরী ভিত্তিতে প্রদান করা প্রয়োজন।

১২। জমিজমা সংক্রান্ত কাগজাদি সংরক্ষণের অভাব ঃ

দেশের আদালতসমূহে দায়েরকৃত অধিকাংশ মামলার উৎপত্তি জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধ থেকে। দেখা যায় যে, একই জমির মালিকানা দাবী করে আরও চার- পাঁচটি মামলা হচ্ছে। আবার, একইসাথে এ বিরোধ থেকেই উৎপত্তি হয় বিভিন্ন ফৌজদারি মামলারও। আর জমিজমা সংক্রান্ত এ ধরনের বিরোধের মূল কারণই হলো জমিজমার রেকর্ডপত্র, ফাইলপত্র এবং তা সংরক্ষণের সুব্যবস্থার অভাব।

সুপারিশ ঃ

জমিজমা সংক্রান্ত দলিলাদি, রেকর্ডপত্র, ফাইলপত্র ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজাদির যথাযথ সংরক্ষণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই বিষয়সমূহ ডিজিটাইজড করতে হবে এবং আদালতে সেই ডিজিটাইজ দলিলাদির সহজ প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে হবে।

১৩। প্রচলিত বিচার ব্যবস্থায় মামলা নিষ্পত্তিতে ব্যবহারিক জটিলতা (Procedural complexities) ঃ

সাধারণত বিচার প্রক্রিয়ার প্রায় প্রতিটি স্তর আইনের ছকে বাধা ফলে প্রচলিত পদ্ধতিতে মামলা নিষ্পত্তি করতে অনেক বিলম্ব হয়ে যায়। মামলা দায়ের থেকে শুরু করে ডিক্রি জারী পর্যন্ত মামলার পক্ষগণকে বিপুল সময় ব্যয় করতে হয়। এছাড়াও মামলা চালাতে গিয়ে মামলার পক্ষদেরকে আইন, আদালত ও আইনজীবীর পেছনে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়, যা মামলার বিষয়বস্তু বা অনেক সময় সম্পত্তির মূল্যমানকে ছাড়িয়ে যায়। এর ফলে

মামলায় পক্ষগণের উপর একদিকে যেমন মানসিক চাপ বাড়ছে, অন্যদিকে দীর্ঘদিন ধরে মামলা চালাতে গিয়ে মানুষ নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে।

সুপারিশঃ

ক) মামলা জট কমাতে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি বাস্তবায়ন এবং এর সুবিধা ও ফলাফল সম্বন্ধে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

খ) দেওয়ানী আইনের বিধান অনুযায়ী বাধ্যতামূলকভাবে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (Alternative Dispute Resolution-ADR) এর শুনানীর যে বিধানটি রয়েছে তা ইতিবাচক প্রয়োগে সচেষ্ট হতে হবে এর চেষ্টা করতে হবে।

গ) দেওয়ানী বিরোধের ক্ষেত্রে মধ্যস্থতার মাধ্যমে মামলার নিষ্পত্তির জন্য বিচারক এবং মধ্যস্থতাকারীদের উপযুক্ত মূল্যায়নের (Effective Incentive) লক্ষ্যে বাস্তবসম্মত বিধিবিধান প্রবর্তণ করা যেতে পারে।

১৪। **সাক্ষীর অনুপস্থিতি ঃ**

সাক্ষ্য গ্রহণে বিলম্ব মামলার দীর্ঘসূত্রতার একটি অন্যতম প্রধান কারণ।

সুপারিশ ঃ

ফৌজদারী মামলায় পুলিশকে দ্রুত সাক্ষীর উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। ডিজিটাল আইনের আওতায় দূরবর্তী স্থান থেকেও সাক্ষ্য গ্রহণ করার পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে। স্পর্শকাতর মামলা প্রমাণে সাক্ষীর উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য 'সাক্ষী সুরক্ষা আইন' প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

১৫। ক্রমাগত শুনানী ঃ

CRO এর ১২৫-১২৬ বিধিতে এবং Cr.RO এর ৩৩-৩৪ বিধিতে সুস্পষ্ট বিধান থাকা স্বত্ত্বেও একটি মোকদ্দমায় ক্রমাগত সাক্ষ্য গ্রহণ না করে দিনের পর দিন শুনানী মুলতবী করা হচ্ছে। ফলে বিচার কার্যক্রমে দীর্ঘসূত্রিতার সৃষ্টি হচ্ছে।

সুপারিশ ঃ

শুধুমাত্র বিশেষ জরুরী কারণে মামলার চূড়ান্ত শুনানী পর্যায়ে মামলাটি স্বল্পতম সময়ের জন্য মুলতবি করা যেতে পারে। শুনানী প্রলম্বিতকরণ রোধকল্পে CRO এবং Cr.RO এর বিধিতে উল্লিখিত বিধান বিচারকদের মান্য করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৬। প্রশিক্ষণ ঃ

যদিও প্রাথমিক অবস্থায় বিচারকগণের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ, সার্ভে সেটেলমেন্ট ট্রেনিং সহ যাবতীয় সকল ট্রেনিং এবং extensive in-service training সহ অন্ততঃ দেড় বছর প্রশিক্ষণ দেয়ার পূর্বে আদালতে সরাসরি বিচারিক কার্যক্রমে নিয়োজিত করা একেবারেই ঠিক নয়, কিন্তু বর্তমানে অতি স্বল্প মেয়াদে সামান্য প্রশিক্ষণ দিয়েই জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট অথবা সহকারী জজ আদালতে বিচারকগণ বিচার কার্যে নিয়োজিত হচ্ছেন। এর ফলে তাদের অনভিজ্ঞতার কারণে মামলা নিষ্পত্তিতে যেমন দীর্ঘসূত্রতা হচ্ছে তেমনি ভুল-ভ্রান্তি থেকে যাবার সম্ভাবনা বাড়ছে, ন্যায়বিচার ব্যাহত হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে আপীল ও রিভিশনের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সুপারিশ ঃ

বিচারকগণের জন্য কমপক্ষে দেড় বছর বিভিন্ন রকমের ব্যাপক (extensive) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। তৎপর, কমপক্ষে ৬ মাস আদালতে বিচারকদের সাথে বসে প্রায়োগিক (practical) প্রশিক্ষণ নিতে হবে।

১৭। নকল সরবরাহের ক্ষেত্রে অনিয়ম ঃ

প্রায়ই দেখা যায় যে, মামলার পক্ষগণ বিভিন্ন প্রয়োজনে মামলার রায় ও বিভিন্ন আদেশের সহি মোহরকৃত নকল নিতে গেলে নকলকারীর অপ্রতুলতা, টাইপ মেশিন/ কম্পিউটারের অপ্রতুলতা, দুর্নীতি ইত্যাদি কারণে রায় ও আদেশের নকল পাওয়ার ক্ষেত্রে হয়রানি ও দীর্ঘসূত্রিতার শিকার হন।

সুপারিশ ঃ

নকলখানার দায়িত্বপ্রাপ্ত বিচারক নকল সরবরাহ বিষয়ে কার্যকরভাবে তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে নকল প্রস্তুত হওয়া সংক্রান্তে নোটিশবোর্ড পরিদর্শনসহ কোন নকল কখন প্রস্তুত হচ্ছে এবং না হলে কেন প্রস্তুত হচ্ছে না সে ব্যাপারে ত্বরিৎ পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে নকল প্রদানে দীর্ঘসূত্রিতা দূরীকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১৮। উচ্চ আদালত কর্তৃক নথি তলব হওয়া ঃ

বিবিধ প্রয়োজনে অনেক সময় উচ্চ আদালত কর্তৃক নিম্ন আদালত হতে বিভিন্ন মামলার নথি তলব করা হয়। কিন্তু আদালতসমূহে পরিসংখ্যান অবলোকনে প্রতীয়মান হয় যে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও নথিগুলো নিয়মিতভাবে নিম্ন আদালতে ফেরত আসে না। এছাড়া বিভিন্ন মামলায় সুপ্রীম কোর্টের কোন বেঞ্চের আদেশের অনুলিপি নিম্ন আদালতে প্রেরণের নির্দেশ পালনের ক্ষেত্রে বিলম্ব মামলা জট সৃষ্টির অন্যতম কারণ।

সুপারিশ ঃ

এক্ষেত্রে কোন মামলা/আপীল কিংবা রিভিশনে নিম্ন আদালতের বিচারাধীন মামলার নথি তলব করা হলে উক্ত মামলা/আপীল কিংবা রিভিশন অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যথা সম্ভব দ্রুত নিষ্পত্তিঅন্তে তলবকৃত নথি ফেরত দেয়ার বিষয়ে প্রতিটি পর্যায়ে কঠোর তদারকিসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে কোন অবহেলা বা পেশাগত অসদাচরণ পরিলক্ষিত হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বরখাস্ত করা সহ কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৯। <u>সংশ্লিষ্ট মামলার আদেশের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে রিভিশন মোকদ্দমা নিষ্পত্তিতে বিলম্বজনিত দীর্ঘসূত্রিতা</u> ঃ

আদালতের কোন আদেশের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে রিভিশন দাখিল করা হলে এবং উক্ত রিভিশন মোকদ্দমায় মূল মামলার বিপরীতে কোন স্থগিতাদেশ প্রদান না করা সত্ত্বেও, রিভিশন মামলার সিদ্ধান্ত মূল মামলার গতি-প্রকৃতিকে প্রভাবান্বিত করতে পারে এরূপ সম্ভাব্য miscarriage of justice এড়ানোর আশংকায় অনেক ক্ষেত্রেই নিম্ন আদালতের বিচারকগণ সংশ্লিষ্ট মামলার বিচারকার্য সাময়িকভাবে স্থগিত রাখেন।

সুপারিশ ঃ

উচ্চ আদালতে আদেশ বা রায় হতে উদ্ভূত রিভিশন আদেশ প্রদানে বিলম্ব হ্রাসকরণ এবং রায় ও নথি (যদি তলব করা হয়ে থাকে) দ্রুত ফেরত পাঠানোর মাধ্যমে বিষয়টি সমাধান করা যেতে পারে।

২০। <u>উচ্চ আদালত কর্তৃক স্থগিতাদেশ ঃ</u>

উচ্চ আদালত কর্তৃক মূল মামলার বিচারকার্যে স্থগিতাদেশ প্রদানের মাধ্যমেও অনেক সময় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মামলার বিচার প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হয়।

সুপারিশ ঃ

ক) কোন মামলায় স্থগিতাদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

খ) রিভিশন মামলাগুলির মধ্য হতে বিশেষ করে আদেশ হতে উদ্ভূত রিভিশন মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তি করা প্রয়োজন, সম্ভব হলে পূর্বের ন্যায় returnable তারিখেই অন্তত cause-list এ আসা প্রয়োজন।

২১। মনিটরিং কমিটি ঃ

দেশের বিচার ব্যবস্থায় মামলার দীর্ঘসূত্রিতা কমাতে সময়ে সময়ে আইন কমিশন যে সুপারিশ প্রদান করেছিল তার মধ্যে অন্যতম একটি সুপারিশ ছিল যে মামলা জট কমানোর ক্ষেত্রে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের মনিটরিং এর বিকল্প নাই, বিধায় মামলার সার্বিক কার্যক্রম তদারকির জন্য পৃথক মনিটরিং সেল গঠন করতে হবে। এটি অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট প্রত্যেক জেলার মামলা তদারকির জন্য পৃথক মনিটরিং সেল গঠন করেছে এবং মনিটরিং সেল গঠনের পর থেকে মামলা নিষ্পত্তির হার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে একই জেলায় বা বিভাগে একই মনিটরিং কর্মকর্তা দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করলে সেক্ষেত্রে মামলা নিষ্পত্তির কলাকৌশলে বৈচিত্র্যতার অভাব পরিলক্ষিত হতে পারে।

সুপারিশ ঃ

বিচার ব্যবস্থায় নিত্য নতুন কৌশল ও আইন প্রয়োগের মাধ্যমে মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে নিয়মিত বিরতিতে মনিটরিং কর্মকর্তা পরিবর্তন ইতিবাচক পরিবর্তন বয়ে আনবে।

২২। বিচারক পদায়ন, শৃঙ্খলা সংক্রান্ত ঃ

বর্তমানে জেলা পর্যায়ের বিচার কর্মবিভাগ, আইন মন্ত্রণালয় ও সুপ্রীম কোর্টের উভয়ের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। এ ক্ষেত্রে আইন কমিশনের অভিমত এই যে বিদ্যমান ব্যবস্থায় একধরণের Checks and

Balance রয়েছে। বিচার প্রার্থীগণের ন্যায় বিচার সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিচার কর্মবিভাগে প্রকৃত ও অর্থবহ তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন, যার মাধ্যমে বিচার ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা ফিরে আসবে।

দেওয়ানি মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ঃ

বিশদভাবে বিশ্লেষণে বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থায় দেওয়ানি আদালতসমূহে দেওয়ানি মামলা বিচারের ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রিতার কারণসমূহ এবং তা রোধে আইন কমিশনের পর্যালোচনা নিম্নরূপ :

১। সমন ও নোটিশ জারীতে বিলম্ব ঃ

আদি এখতিয়ারসম্পন্ন দেওয়ানী আদালতসমূহে মামলা দায়েরের পরবর্তী পর্যায়ে মামলার বিচার প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে বেশী সময় বিলম্বিত হয় মামলার সমন ও নোটিশ জারীতে। ক্ষেত্রবিশেষে, শুধু এই কারণেই মামলা নিষ্পত্তিতে কয়েক বছরের দীর্ঘসূত্রিতার সূত্রপাত ঘটে।

তাছাড়া কোন কোন ক্ষেত্রে বাদীপক্ষ কর্তৃক সমনে বিবাদীর ভুল নাম কিংবা ভুল ঠিকানা প্রদান করা হয়, বিধায় ঐ ত্রুটিপূর্ণ সমন জারী সম্ভবপর হয় না। যার ফলে সম্পূর্ণ মামলাটির বিচার প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হয়।

মূলত দুইশত বছরের পুরোনো সমন জারী সংক্রান্ত পদ্ধতি এবং প্রতি বছর বিপুল পরিমান দায়েরকৃত মামলার বিপরীতে সমন জারীর জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল না থাকায়, সমন জারীতে কাঙ্খিত মাত্রা অর্জন সম্ভবপর হয়নি। এছাড়া ভিন্ন জেলার সমন/নোটিশ জারীতে অপেক্ষাকৃত অধিকহারে প্রলম্বিত হওয়ার প্রবণতার বিষয়টি বিশেষভাবে প্রতীয়মান হয়। তাছাড়া, নেজারতের কর্মচারী ও জারীকারকদের বিরুদ্ধে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ অহরহ পাওয়া যায়, যা এখন মহামারীর পর্যায়ে পৌঁছেছে।

সুপারিশ ঃ

ক) সমন জারী সংক্রান্ত বিষয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে সার্বক্ষণিক তদারকি করা বিশেষ প্রয়োজন।

খ) জারীকারকের সংখ্যা প্রয়োজন অনুযায়ী বৃদ্ধি করতে হবে।

গ) জারীকারকদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ঘ) জারীকারকদের বেতন বৃদ্ধি সহ প্রতিটি জারীর জন্য পর্যাপ্ত রাহা খরচ ও incentive হিসাবে ভাতা প্রদান করতে হবে।

ঙ) দেওয়ানি কার্যবিধিতে ভিন্ন জেলায় সমন/নোটিশ জারীতে অস্বাভাবিক বিলম্ব রোধে সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা জজকে দায়বদ্ধতার আওতায় আনা প্রয়োজন।

চ) তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কোনরূপ অসদাচরণ (misconduct) প্রমাণিত হলে বরখাস্ত করাসহ কঠিন প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

২। বিবাদী কর্তৃক লিখিত জবাব দাখিলে অস্বাভাবিক বিলম্বের প্রবণতা ঃ

অনেক সময়ই মামলার বিবাদী/প্রতিপক্ষ লিখিত জবাব দাখিলের জন্য পুনঃপুনঃ সময় নেয়ার মাধ্যমে মামলার দীর্ঘসূত্রিতায় ভূমিকা রাখে।

সুপারিশ ঃ

সময় প্রদানের ক্ষেত্রে বিচারককে আইনে নির্ধারিত বিধান কঠোরভাবে প্রতিপালন করতে হবে।

৩। বাদীপক্ষ কর্তৃক পুনঃপুনঃ আরজি সংশোধন ঃ

অনেক সময়েই জরুরী প্রয়োজনে বাদীপক্ষ মামলার প্রয়োজনীয় সকল দলিলাদি ব্যতিরেকে মামলা দায়ের করতে বাধ্য হয়। ফলশ্রুতিতে বাদীপক্ষকে পরবর্তীতে আরজি সংশোধনের দরখাস্ত আনয়ন করতে হয়। আবার এ ধরনের দরখাস্ত পুনঃ পুনঃ দাখিল ও মঞ্জুর হলে অনেকক্ষেত্রেই নতুন করে তদ্বির গ্রহণের

প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় কিংবা অনেকক্ষেত্রে বিবাদীপক্ষকে অতিরিক্ত জবাব দাখিলের সুযোগ দিতে হয়। যার ফলে সামগ্রিকভাবে মামলার বিচার প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হতে থাকে।

উল্লেখ্য এ সমস্যা আরও প্রকট আকার ধারণ করে যখন মামলার বাদীপক্ষ বিচার স্তরে (কখনো কখনো সাক্ষ্য গ্রহণের শেষ পর্যায়ে) এ ধরণের দরখাস্ত আনয়ন করে।

সুপারিশ ঃ

বাদীপক্ষের আরজি সংশোধনের পৌনঃপুনিকতা ও বিবাদীপক্ষের লিখিত জবাব দাখিলে অস্বাভাবিক বিলম্ব রোধকরণে আদালতসমূহ কর্তৃক আইনের বিধান দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করা।

৪। অন্তর্বর্তীকালীন দরখাস্ত দাখিলের প্রবণতা ঃ

বিভিন্ন আদালতে মামলার বিচার চলাকালে বিভিন্ন অন্তর্বর্তীকালীন দরখাস্ত এবং তদপ্রেক্ষিতে প্রদত্ত আদেশ মামলার বিচার প্রক্রিয়াকে বিলম্বিত করে। এর কয়েকটি নমুনা সংক্ষেপে উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ

(১) মামলার বিচার পর্যায়ে discovery, inspection, injunction এর দরখাস্ত আনয়ন ;

(২) এডভোকেট কমিশনার নিয়োগে বিলম্ব ;

(৩) পুনঃপুনঃ কমিশনের দরখাস্ত আনয়ন ও কমিশনার নিয়োগ ;

(৪) কমিশন রিপোর্ট দাখিলে অস্বাভাবিক বিলম্ব এবং প্রায়শঃই রিপোর্টের উপর আপত্তি প্রদান।

আবার অনেক ক্ষেত্রে এ ধরণের দরখাস্তসমূহের উপর আদেশ প্রদান করা হলে তার বিরুদ্ধে রিভিশন দাখিল করা হয় এবং ক্ষেত্র বিশেষ উক্ত রিভিশনসমূহ নিষ্পত্তিতে বছরের পর বছর অতিক্রান্ত হয়, ফলে সামগ্রিকভাবে মামলার দীর্ঘসূত্রিতা বৃদ্ধি পায়।

সুপারিশ ঃ

ক) এক্ষেত্রে এ ধরনের দরখাস্তসমূহ মঞ্জুর করার ক্ষেত্রে বিচারককে আইনে নির্ধারিত বিধান কঠোরভাবে প্রতিপালন করতে হবে।

খ) বিচারকগণকে এ ধরনের অন্তর্বর্তীকালীন দরখাস্তসমূহ দ্রুততার সাথে নিস্পত্তি নিশ্চিত করার চেষ্টা করতে হবে ।

গ) রিভিশন মামলার মোশান যথেষ্ট সময় নিয়ে বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় আদেশ প্রদান করতে হবে।

৫। বাদীপক্ষে প্রয়োজনীয় তদবির গ্রহণে সময়ক্ষেপনের প্রবণতা ঃ

দেওয়ানী আদালতসমূহের দেওয়ানী মামলার পরিসংখ্যান নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মামলা বাদীপক্ষের প্রয়োজনীয় তদ্বির গ্রহণে অনীহা বা অহেতুক সময়ক্ষেপনের কারণে বিলম্বিত হয়।

তাছাড়া বন্টনের মোকদ্দমায় বিবাদীপক্ষের মৃত্যুজনিত কারণে ওয়ারিশদের নাম, ঠিকানা সংগ্রহ ও তাদের কায়েম মোকামসহ প্রসেস জারী করার ব্যাপারে বাদীপক্ষ কর্তৃক অহেতুক সময় নেয়ার কারণে উক্ত মামলাসমূহের বিচার প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হয়।

সুপারিশ ঃ

এক্ষেত্রে সময় প্রদানের ক্ষেত্রে বিচারককে আইনে নির্ধারিত বিধান কঠোরভাবে প্রতিপালন করতে হবে।

৬। দেওয়ানী আদালতসমূহে ছানী মামলার আধিক্য ঃ

একটি দেওয়ানী মোকদ্দমা দায়েরের অব্যবহিত পর থেকেই উক্ত মোকদ্দমার দীর্ঘসূত্রিতার প্রক্রিয়া শুরু হয়। অনেক সময় একতরফা কিংবা আংশিক দোতরফা সূত্রে একটি মোকদ্দমা নিস্পত্তি হলে অনেকক্ষেত্রেই উক্ত মামলার রায়ের বিরুদ্ধে ছানী মামলা দায়ের হয় এবং এতে মূল মামলা দীর্ঘসূত্রিতার নতুন মাত্রা পায়। ফলে প্রাথমিকভাবে নিস্পত্তি হবার পরেও একটি মামলা বছরের পর বছর ছানী মামলা আকারে আদালতে বিচারাধীন

থাকে এবং উক্ত ছানী মঞ্জুর হলে মূল মামলাটি নুতন করে আরম্ভ হয়। অনেকক্ষেত্রেই উপর্যুক্ত সামগ্রিক প্রক্রিয়া কোন একটি মামলাকে বছরের পর বছর প্রলম্বিত করে। আবার বিবাদীপক্ষও একজন একজন করে ছানি মামলা করে ইচ্ছাকৃতভাবে মামলা দীর্ঘায়িত করে।

সুপারিশ ঃ

ছানি মামলাসমূহ মঞ্জুরের ক্ষেত্রে আইনে প্রদত্ত বিধিবিধান কঠোরভাবে প্রতিপালন করতে হবে।

৭। আপীল আদালত কর্তৃক পুনঃবিচারে প্রেরণের প্রবণতা ঃ

অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় যে, আপীল আদালতসমূহের পক্ষে কোন একটি আপীল নিষ্পত্তি করা সম্ভব হওয়া সত্ত্বেও উপযুক্ত কারণ ব্যতিরেকে উক্ত মামলা নিম্ন আদালতে পুনরায় বিচারের জন্য প্রেরণ করা হয়। এ কারণে দেওয়ানি মামলায় দীর্ঘসূত্রিতার উদ্ভব ঘটে।

আবার কখনো দেখা যায় যে, পুনঃ বিচারে মামলা প্রেরণ করার পরে অনেকসময়ই মামলার পক্ষসমূহ সংশ্লিষ্ট আদেশের নির্দেশনা মোতাবেক প্রয়োজনীয় তদ্বির গ্রহণে অহেতুক সময়ক্ষেপন করে, যার ফলে মামলার দীর্ঘসূত্রিতা বৃদ্ধি পায়।

সুপারিশ ঃ

সাক্ষ্য গ্রহণসহ আপীল আদালতের বিচারিক আদালতের সকল ক্ষমতা রয়েছে বিধায় পুনঃবিচারের জন্য না পাঠিয়ে আপীল আদালতেই যথাসম্ভব মামলাটি নিষ্পত্তি করাই সঙ্গত। তাতে উভয় পক্ষেরই সময়, পরিশ্রম ও ব্যয় অনেকাংশে লাঘব হবে।

৮। পারিবারিক মামলাতে আপোষের অজুহাতে সময়ক্ষেপন ঃ

দেশের বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন পারিবারিক মামলাসমূহের পক্ষদ্বয় আপোষের অজুহাতে পুনঃপুনঃ সময় নেয়ার কারণে পারিবারিক মামলার মত অপেক্ষাকৃত সহজ মোকদ্দমাতেও অনেকক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রিতা দেখা যায়। এছাড়া পারিবারিক জারী মামলাতে লেভী ওয়ারেন্ট ঠিকমত জারী না হওয়ার কারণে পারিবারিক জারী মামলা নিষ্পত্তিতে বিলম্ব ঘটে।

সুপারিশ ঃ

এ প্রেক্ষাপটে সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তড়িৎ পদক্ষেপ গ্রহণ করলে এ জাতীয় মামলা দ্রুত নিস্পত্তি করা সম্ভব হবে।

দেওয়ানি আপীল ও রিভিশন আদালতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ঃ

আপীল আদালতসমূহে দেওয়ানী আপীল ও রিভিশন মোকদ্দমার বিচারে দীর্ঘসূত্রিতার কারণসমূহ ঃ

১। নথিতে এল.সি.আর. সামিল হতে দেরী হওয়া ;

২। ভিন্ন জেলার নোটিশ বারবার গরজারী হওয়া বা নোটিশ জারীতে অস্বাভাবিক বিলম্ব হওয়া;

৩। আপীলকারী পক্ষের প্রয়োজনীয় তদবিরের অভাব কিংবা তদবির গ্রহণে অস্বাভাবিক বিলম্ব করা;

৪। আপীলের মেমোতে নোটিশ জারীর ঠিকানা সঠিক না থাকা;

৫। রেসপনডেন্ট এর মৃত্যুতে প্রয়োজনীয় তদবিরের অভাব;

৬। আপীলের মেমোতে পুনঃপুনঃ সংশোধন আনয়ন;

৭। বিশেষজ্ঞ মতামত সম্পর্কিত প্রতিবেদনের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ সাক্ষী গ্রহণে অহেতুক সময়ক্ষেপন;

৮। অতিরিক্ত সাক্ষ্য গ্রহণে মামলার পক্ষসমূহের সময়ক্ষেপন;

৯। আপীলের বিভিন্ন পর্যায়ে পক্ষগণের অতিরিক্ত সময় গ্রহণ ও কালক্ষেপন;

১০। তলবকৃত নথি প্রেরণে বিলম্ব;

১১। নানা কারণে মামলা চূড়ান্ত শুনানি (PH) এর তালিকা হতে প্রত্যাহার।

সুপারিশ ঃ

উপরিউক্ত সমস্যাসমূহ সমাধানে আইনে উল্লিখিত বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করতে হবে। তাছাড়া জেলা জজ উক্ত বিষয়সমূহে CRO অনুসারে নিয়মিত মাসিক ভিত্তিতে মনিটরিং এর ব্যবস্থা নিশ্চিত করবেন।

জারী মামলার ক্ষেত্রে ঃ

দেওয়ানী মোকদ্দমার ক্ষেত্রে আদালত কর্তৃক রায় ও ডিক্রি ঘোষণাঅন্তে যে পক্ষের অনুকূলে রায় ঘোষিত হয় তার স্বাভাবিক প্রত্যাশা থাকে যে রায়টি দ্রুত কার্যকর হবে। কিন্তু বর্তমানে প্রচলিত The Code of Civil Procedure, 1908 এর জারী সংক্রান্ত বিধান অত্যন্ত জটিল ও সময়সাপেক্ষ, ফলে অন্যান্য মামলার ন্যায় জারী মামলার সংখ্যাও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক প্রকাশিত ১ জানুয়ারি, ২০২৩ হতে ৩০ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত বাংলাদেশের মামলার পরিসংখ্যানমূলক প্রতিবেদন পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় বিচারাধীন সকল প্রকার জারী মামলার মোট সংখ্যা ৯৫,৫০২ টি, যা মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রিতার অন্যতম প্রধান কারণ। তাছাড়া একটি জারী মামলায় নানাধরণের ধাপ অনুসরণ করার বিধি বিধান থাকায় উক্ত ধাপসমূহ অনুসরণপূর্বক মামলা নিষ্পত্তি অনেক সময়সাপেক্ষ ব্যাপার হয়ে দাড়ায়। অধিকন্তু, কিছু কিছু ক্ষেত্রে জারী মামলায় অন্য বিভাগের কর্মকর্তা কর্মচারীদের সহযোগিতাও প্রয়োজন হয়। দেশের অধস্তন দেওয়ানি আদালতের অনিষ্পন্ন জারী মামলার প্রবণতা পর্যালোচনায় দেখা যায় যে জারী মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পৃথক কোন আদালত বা বিচারক না থাকায় একই বিচারকের পক্ষে দেওয়ানি মামলা নিষ্পত্তি, সাক্ষ্যগ্রহণ, অর্ন্তবর্তী আবেদনসমূহ নিষ্পত্তি দুরূহ হয়ে পড়ে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে জারী মামলার কার্যক্রমের সঙ্গে বিজ্ঞ আইনজীবীদের সংশ্লিষ্টতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু বাস্তবতা এই যে বিজ্ঞ আইনজীবীগণের জারী মামলা নিষ্পত্তিতে প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতার অভাব থাকায় একই বিষয়ে বিভিন্ন ধরণের আপত্তি উত্থাপিত হয়ে থাকে। ফলে মামলা নিষ্পত্তিতে বিলম্ব হয়। তাছাড়া সার্ভে বিষয়ে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বিজ্ঞ আইনজীবীর অপ্রতুলতা বাটোয়ারা মোকদ্দমা জারীর কার্যক্রমকে দীর্ঘায়িত করে। আইনের বিধান অনুযায়ী জারী কার্যক্রমে অনেক ক্ষেত্রে আদালতকে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে উক্ত প্রশাসনের পক্ষ হতে প্রেরিত জনবল ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ফি-এর পরিমাণ সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট কোনো বিধান না থাকায় তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে আদালতকে অনেকক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রিতার সম্মুখীন হতে হয়। ফলশ্রুতিতে জারী মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়।

লক্ষ্যণীয় যে জারী মামলার কার্যক্রম পরিচালনায় একজন বিচারক, আইনজীবী ও সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর কী কী ভূমিকা রয়েছে বা কিভাবে উক্ত কার্যক্রম সহজসাধ্য ও দ্রুততম সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করা যায় এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা, প্রশিক্ষণের অপ্রতুলতা ও তদারকির অভাব জারী মামলা নিষ্পত্তিতে নেতিবাচক ভূমিকা রাখে।

বাস্তবতায় দেখা যায় জারী মামলাকে বিলম্বিত করার জন্য বা ফলপ্রসূ নিষ্পত্তিতে বাধা প্রদানের লক্ষ্যে অনেক দালাল শ্রেণির লোকসহ আদালতের সংশ্লিষ্ট কর্মচারী ও মামলা পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট অংশীজনেরা দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে। বিধায় আদালতের সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও দ্রুততম সময়ে ও কার্যকরভাবে জারী মামলা নিষ্পত্তি করা সম্ভবপর হয়না। তাছাড়া, কতিপয় মামলাবাজ ব্যক্তি বা আইনজীবী জারী মামলার কার্যক্রম যাতে নিষ্পত্তি না হয় সে বিষয়ে নানা অজুহাতে দরখাস্ত দায়ের করে জারী কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্থ করে। তাদের দৌরাত্ম্য রোধ করা আদালতের একার পক্ষে সম্ভব না হওয়ায় মামলার পক্ষ দ্রুততম সময়ের মধ্যে আদালতের রায়ের সুফল ভোগ করতে ব্যর্থ হয়।

অধিকন্তু, মূল মামলা নিষ্পত্তি পরবর্তী আপীল বা রিভিশন আদালতসহ উচ্চ আদালত কর্তৃক অনির্দিষ্ট কালের জন্য জারী মামলার কার্যক্রমের উপর স্থগিত আদেশ প্রদান করা হয়। ফলশ্রুতিতে উক্ত জারী মামলাটি দীর্ঘদিন যাবত অনিষ্পন্ন অবস্থায় পড়ে থাকে।

সুপারিশ ঃ

১। বর্তমানে প্রচলিত The Code of Civil Procedure, 1908 এর জারী সংক্রান্ত বিধান অত্যন্ত জটিল ও সময়সাপেক্ষ হওয়ায় এ বিষয়ে বাস্তবসম্মত সংশোধন আনয়ন করা প্রয়োজন।

২। জারী মামলা নিষ্পত্তির জন্য প্রত্যেক জেলায় একটি করে জারী মামলা আদালত (Designated Execution Court) পদ সৃজন করে একজন জ্যেষ্ঠ বিচারিক কর্মকর্তাকে নিয়োগ প্রদান করা হলে সেক্ষেত্রে জারী মামলা নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত হবে। উক্ত আদালতের একমাত্র দায়িত্ব হবে জেলার সকল জারী মামলা পরিচালনা ও নিষ্পত্তি করা এবং এক্ষেত্রে উক্ত বিচারকের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

৩। জারী মামলার কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞ আইনজীবীদেরকে দক্ষ হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৪। জারী মামলার কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞ আইনজীবীদের সার্ভে বিষয়ে অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধকরণে বার ও বেঞ্চের সমন্বয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৫। জারী কার্যক্রমে নির্বাহী ও পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ হতে প্রেরিত জনবল ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দায়িত্ব পালনে ব্যয়ভার প্রদানের নিমিত্ত দূরত্ব ও জনবলের সংখ্যা বিবেচনায় সুনির্দিষ্ট ফিস নির্ধারণ করতে হবে।

৬। সহজসাধ্য ও দ্রুততম সময়ের মধ্যে জারী মামলার কার্যক্রম নিষ্পন্ন করার নিমিত্ত বিচারক, আইনজীবী ও সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর ভূমিকা বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৭। জারী মামলাকে বিলম্বিত করার জন্য বা ফলপ্রসূ নিষ্পত্তিতে বাধা প্রদানের লক্ষ্যে কোনো দালাল শ্রেণির লোকসহ আদালতের সংশ্লিষ্ট কর্মচারী ও মামলা পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট অংশীজনেরা যাতে দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করতে না পারে সে বিষয়ে আদালতকে কঠোর ভূমিকা পালন করতে হবে। এ বিষয়ে কারো বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ প্রমাণিত হলে সেক্ষেত্রে তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আওতায় আনতে হবে।

৮। জারী মামলা যাতে দ্রুততম সময়ে নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয় সে লক্ষ্যে জারী মামলা কার্যক্রমের উপর স্থগিত আদেশ প্রদানকারী আদালতকে দাখিলী আপত্তি, আপীল, রিভিশন, রীট বিষয়ে দ্রুতসময়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করে সংশ্লিষ্ট আদালতকে অবহিত করতে হবে।

৯। বাটোয়ারা সহ অন্যান্য মামলার ক্ষেত্রে চলমান জারী মামলায় কোন পক্ষের মৃত্যুজনিত কারণে জারী কার্যক্রমকে প্রলম্বিত না করে স্বল্প সময়ের মধ্যে কায়েম মোকাম করে কার্যক্রমকে চলমান রাখতে হবে। কায়েম মোকামের ক্ষেত্রে প্রকৃত ওয়ারিশদের উপর যাতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নোটিশ জারী হয় সে বিষয়ে আদালতকে সজাগ থাকতে হবে।

১০। বাটোয়ারাসহ অন্যান্য জারী মামলায় তৃতীয় পক্ষ যুক্ত হওয়ার আবেদন করলে বস্তুতপক্ষে উক্ত পক্ষের আবেদনের কতটুকু সারবত্তা আছে বা মামলার নালিশী জমিতে উক্ত তৃতীয় পক্ষের প্রকৃত স্বার্থ, স্বত্ব ও অধিকার নিহিত রয়েছে কিনা সে বিষয়ে জারী কার্যক্রম পরিচালনাকারী আদালতকে সচেতন থাকতে হবে।

ফৌজদারি আদালতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ঃ

বাংলাদেশের ফৌজদারি মামলার বিচার দেওয়ানি মামলার তুলনায় অপেক্ষাকৃত অধিকতর বিস্তৃত একটি প্রক্রিয়া। ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় Administration of Justice সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে আদালতসমূহের পাশাপাশি দেশের আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিশেষ করে তদন্তকারী সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন। বিশেষত ফৌজদারি মামলার তদন্ত, অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট আলামত জব্দ ও সংরক্ষন, আদালতে ফৌজদারি মামলাসমূহের সাক্ষীদের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ, আদালতে তদন্তের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাক্ষ্য উপস্থাপনের মাধ্যমে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দেশের নিম্ন আদালতসমূহ Prosecution ও আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উপর অনেকাংশেই নির্ভরশীল।

ফৌজদারি মামলার বিচার প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রিতার কারণ ও তা রোধে সুপারিশসমূহ ঃ

১। <u>মামলা গ্রহণ না করার প্রবণতা</u> ঃ

অনেক সময় থানা প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অভিযোগকারীর অভিযোগ গ্রহণ করতে চায় না। আবার অনেকসময় ঘটনা অন্য থানার এখতিয়ারাধীন অজুহাতেও থানা মামলা গ্রহণ করতে চায় না। আবার, অনেকক্ষেত্রে আমলযোগ্য অপরাধের অভিযোগে নালিশী দরখাস্ত আদালতে দাখিল করা হলে আদালত অভিযোগটির গুরুত্ব বিবেচনায় তা সরাসরি FIR হিসেবে রেকর্ড করতঃ পরবর্তী কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ প্রদান করলেও ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আদালতের নির্দেশ মোতাবেক অভিযোগটিকে FIR হিসেবে রেকর্ড করার ক্ষেত্রে গড়িমসি ও সময়ক্ষেপণ করেন।

সুপারিশ ঃ

থানায় অভিযোগকারীর এজাহার তাৎক্ষণিকভাবে গ্রহণ করতঃ দ্রুত তদন্ত আরম্ভ করতে হবে। যদি ঘটনাস্থল অন্য থানার এলাকার মধ্যে হয় তাহলেও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে এজাহার লিপিবদ্ধ করে তড়িৎ সংশ্লিষ্ট থানায় নিজ দায়িত্বে তা প্রেরণ করতে হবে। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কোন কারণে এজাহার গ্রহণ না করলে তার কারণ লিপিবদ্ধ করবেন। আবার, আদালত হতে কোন অভিযোগকে সরাসরি FIR হিসেবে রেকর্ড করার জন্য কোন আদেশ পাওয়ামাত্র সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগটিকে FIR হিসেবে রেকর্ড করে আদালতকে তাৎক্ষণিকভাবে অবহিত করবেন।

২। <u>অপরাধের তদন্তে তদন্তকারী সংস্থাসমূহের অতিরিক্ত সময়ক্ষেপনের প্রবণতাঃ</u>

বিভিন্ন আইন নির্দিষ্ট মেয়াদে বিভিন্ন ফৌজদারী মামলাসমূহের তদন্তের জন্য তদন্তকারী সংস্থাসমূহের বাধ্যবাধকতা থাকলেও অনেকক্ষেত্রেই তদন্তকারী সংস্থাসমূহের মধ্যে মামলার তদন্তে অতিরিক্ত সময়ক্ষেপনের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। অনেক সময়ই এই অতিরিক্ত সময়ক্ষেপনে মামলার সাক্ষ্য, তথ্য-উপাত্ত বিনষ্ট হয়, ফলে অপরাধ সংঘটিত হওয়া সত্ত্বেও দুর্বল সাক্ষ্য প্রমাণের কারণে আসামী খালাস পায়, ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হয় এবং সার্বিকভাবে দেশের ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা মারাত্নকভাবে ব্যাহত হয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, মামলায় বারবার তদন্তকারী কর্মকর্তা পরিবর্তন হয়, ফলে তদন্তের ধারাবাহিকতার মারাত্মক ক্ষতি হয় এবং এই সুযোগ আসামীপক্ষ গ্রহণ করতঃ খালাস প্রাপ্ত হয়।

অধিকন্তু, অধস্তন আদালতের মামলার ফলাফল ও মামলার বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে মামলার তদন্ত সম্পর্কিত ত্রুটির কারণে অধিক সংখ্যক মামলার ফলাফল ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তদন্ত ব্যবস্থায় ত্রুটির জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা হয়না। প্রায়শই দেখা যায় যে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬১ ধারায় কোন সাক্ষী কোন আসামীর নাম সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না করা সত্ত্বেও তাদের বিরুদ্ধে কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়া অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়। তাছাড়া জব্দ তালিকা প্রস্তুত, সাক্ষীদের পরীক্ষাকরণ, রিমান্ড আবেদন দাখিলের প্রক্রিয়া, টিআই প্যারেড পরিচালনায় আইনের সুনির্দিষ্ট বিধান প্রতিপালন করা হয়না বিধায় ফৌজদারী মামলায় আসামীদেরকে অযথা হয়রানির শিকার হতে হয়। অধিকন্তু, বস্তুনিষ্ট ও সারবত্তা সম্বলিত তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল না করার কারণে বিচার বিভ্রাট তৈরী হয়। ফৌজদারি মামলার দুর্বলতম স্থান হচ্ছে ভাসাভাসা তদন্ত। প্রকৃত, কার্যকরী ও অর্থবহ তদন্ত ব্যাতিরেকে কখনোই ফৌজদারি মামলা প্রমাণ করা সম্ভব নয়। Indepth তদন্তের পরিবর্তে তদন্তকারী কর্মকর্তা আজকাল প্রায়শই The Code of Criminal Procedure, 1898 এর ১৬৪ ধারার আওতায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীর উপর নির্ভর করেন, যা কখনোই অর্থবহ তদন্তের বিকল্প হতে পারে না। ফলশ্রুতিতে, অপরাধ সংঘটিত হওয়া সত্বেও প্রায়শই প্রকৃত আসামী সাজা পায় না। ন্যায়বিচার নিভৃতে কাঁদে। মূলত পুলিশ প্রশাসন রাষ্ট্রের নানাবিধ কাজে ব্যস্ত থাকায় তারা মামলার তদন্ত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পর্যাপ্ত সময় ও শ্রম প্রদানে ব্যর্থ হয়। তাছাড়া, ফৌজদারী মামলা পরিচালনা সংক্রান্তে বিচারক, পিপি, এপিপিদের সাথে পুলিশ প্রশাসনের সমন্বয়হীনতা পরিলক্ষিত হয়।

সুপারিশ ঃ

ফৌজদারি মামলার তদন্তের জন্য প্রত্যেক জেলায় পৃথক ও স্বাধীন তদন্তকারী সংস্থা গঠন করা হলে এ সমস্যা অনেকখানি লাঘব হওয়া সম্ভব। তবে তদন্তকারী সংস্থায় অধিক সংখ্যক উচ্চ শিক্ষিত কর্মকর্তা নিয়োগ, তাদেরকে আধুনিক তদন্ত প্রক্রিয়ায় যথেষ্ট প্রশিক্ষণ প্রদান, উচ্চহারে বেতনাদী প্রদান এবং প্রতিটি সঠিক তদন্তের জন্য অতিরিক্ত ভাতা incentive হিসাবে প্রদান করা প্রয়োজন। একই সঙ্গে ত্রুটিযুক্ত তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলকারী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে যথাযথ বিভাগীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করাও প্রয়োজন।

এছাড়া ফৌজদারী মামলাসমূহে তদন্তে তদন্তকারী কর্মকর্তাকে নিম্নোক্ত বিষয়াবলী নিশ্চিত করতে হবে:

ক) স্বল্পতম সময়ে সংশ্লিষ্ট আলামতসমূহ জব্দ করা ;

খ) জব্দকৃত আলামত সংরক্ষণে সর্বোত্তম উপায় অবলম্বন করা ;

গ) অসংশ্লিষ্ট জব্দতালিকার সাক্ষী উপস্থাপনে প্রচলিত মানসিকতা পরিহার করা ;

ঘ) ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬১ ধারা মোতাবেক সাক্ষ্য লিপিবদ্ধকরণে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতা বজায় রাখা এবং স্বল্পতম সময়ে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল নিশ্চিতকরণ;

ঙ) দ্রুততার সাথে সংশ্লিষ্ট মেডিকেল সার্টিফিকেট সংগ্রহ করা ;

চ) তদন্ত প্রতিবেদনে সকল প্রকার অস্পষ্টতা পরিহার করা ;

ছ) তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখকৃত অপরাধের সাথে প্রতিবেদনে অভিযুক্ত হিসেবে উল্লেখকৃত প্রত্যেক আসামীর সংশ্লিষ্টতা আলাদা আলাদাভাবে উল্লেখ করা এবং সেই সাথে কোন্ কোন্ সাক্ষীর বক্তব্য প্রাসঙ্গিক তা স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা ;

জ) তদন্তকারী কর্মকর্তা তার তদন্ত কার্যে যাতে সংশ্লিষ্ট সকলের সহায়তা পান তা নিশ্চিত করা;

ঝ) তদন্ত কার্যকে প্রভাবিত করার প্রচেষ্টা হলে প্রচেষ্টাকারীর বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ;

ঞ) সংশ্লিষ্ট উর্দ্ধতন কর্মকর্তা কর্তৃক অপরাধ সংঘটন থেকে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল পর্যন্ত প্রতিটি পদক্ষেপের নিবিড় পর্যবেক্ষন সুনিশ্চিত করা ;

ট) তদন্তকারী কর্মকর্তাগণকে উচ্চতর প্রশিক্ষণ ও লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদান;

ঠ) প্রয়োজনীয় অধিক সংখ্যক পুলিশ কর্মকর্তা ও কনস্টেবল নিয়োগ;

ড) ফৌজদারি মামলার তদন্ত কার্যাবলী পরিচালনায় পুলিশের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে পৃথক মনিটরিং সেল গঠন ;

ঢ) ফৌজদারি মামলার সুষ্ঠু ও কার্যকর তদন্ত নিশ্চিতকরণে পুলিশ, পিপি, এপিপিদের সমন্বিত প্রশিক্ষণ প্রদান ;

ণ) কোন মামলার বিচার সমাপ্তিঅন্তে যদি প্রতীয়মান হয় যে তদন্তে গাফিলতির কারণে কোনো মামলার ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণ বাধাগ্রস্থ হয়েছে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী কর্মকর্তাকে দায়বদ্ধকরতঃ তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩। **এপিপি নিয়োগ ঃ**

ফৌজদারি মামলা পরিচালনায় অধস্তন আদালতে সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত পিপি ও এপিপিগণ দায়িত্ব পালন করেন। বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের পূর্বে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতগুলোতে এপিপি কে সহযোগিতা ও ফৌজদারি মামলা পরিচালনার জন্য প্রত্যেক আদালতে জেলা পুলিশ প্রশাসনের পক্ষে সিএসআইগণ দায়িত্ব পালন করত। তারা মামলার তদন্ত ও তদন্ত পর্যায়ের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে আদালতকে সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রদানে সমর্থ ছিল। তাছাড়া সিএসআইগণকে আদালত সংশ্লিষ্ট সার্বিক কার্যাবলীর জন্য পুলিশ সুপারের নিকট জবাবদিহিতা করতে হতো। ফলে তখন অধিক সংখ্যক মামলা নিষ্পত্তি পরিলক্ষিত হতো। বর্তমানে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতগুলোতে আমলী ফাইলের মামলা পরিচালনার দায়িত্ব সিএসআইগণের উপর ন্যস্ত থাকলেও বিচার ফাইলে তাদের পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট

এপিপিগণ এককভাবে দায়িত্ব পালন করেন বিধায় মামলার তদন্ত ও বিচার পর্যায়ের মধ্যে সমন্বয়হীনতা পরিলক্ষিত হয়। তাছাড়া সংশ্লিষ্ট এপিপিগণ সুনির্দিষ্টভাবে জবাবদিহিতার আওতায় না থাকায় জনগণ প্রকৃত বিচারের সুফল প্রাপ্তিতে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে।

সুপারিশ ঃ

ক) ফৌজদারী মামলার বিচার পরিচালনায় পৃথক প্রসিকিউশন সার্ভিস চালু না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট এপিপিগণকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য পূর্বের ন্যায় পুলিশ প্রশাসনের পক্ষে সিএসআইগণকে দায়িত্ব প্রদান করা আবশ্যক। ফলশ্রুতিতে অধিক সংখ্যক মামলা নিষ্পত্তির পাশাপাশি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

খ) বিভিন্ন আদালতের বিচার কার্যক্রম পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে ফৌজদারী আদালতে মামলা পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট পিপি, স্পেশাল পিপি ও এপিপিদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা আবশ্যক। তাছাড়া নতুন নতুন আইনের তদন্ত কার্যক্রম ও বাস্তবভিত্তিক সমস্যা সমাধানে তাদের দক্ষ করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। অধিকন্তু, মামলা পরিচালনার জন্য তাদের সম্মানীর পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে যাতে করে তারা মামলা পরিচালনায় আগ্রহী হয়ে উঠে।

গ) মামলা পরিচালনায় এপিপিদের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

ঘ) সুদক্ষ ও কর্মোদ্যম পিপি, এপিপি নিয়োগের জন্য পৃথক প্রসিকিউশন সার্ভিস চালু করতে হবে এবং প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে স্বচ্ছতার সাথে তাদের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।

ঙ) দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ এপিপিদেরকে তালিকা থেকে বাদ দিতে হবে।

৪। নারাজী দরখাস্ত শুনানীতে সময়ক্ষেপন ঃ

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে অনেকসময়ই অভিযোগকারীর পক্ষে নারাজী দরখাস্ত আনয়ন করা যায়। কিন্তু উক্ত দরখাস্ত দায়ের হওয়া সত্ত্বেও অনেক সময় ম্যাজিস্ট্রেটগণ দ্রুততম সময়ে যথাযথ আদেশ প্রদান না করার কারণে দীর্ঘসময় যাবৎ উক্ত দরখাস্তসমূহ অনিষ্পত্তিকৃত অবস্থায় পড়ে থাকে এবং এতে সামগ্রিকভাবে মামলার দীর্ঘসূত্রিতা বৃদ্ধি পায়।

সুপারিশ ঃ

ম্যাজিস্ট্রেটগণ নারাজি দরখাস্ত দ্রুত নিষ্পত্তি করার জন্য সচেষ্ট হবেন।

৫। আদালতে সাক্ষীর উপস্থিতি নিশ্চিতকরণে পুলিশ প্রশাসনের ব্যর্থতা ঃ

সমগ্র দেশের আদালতসমূহে ফৌজদারি মামলার বিচার প্রক্রিয়া বিলম্বিত হওয়ার প্রধান কারণ ফৌজদারি মামলার বিচার স্তরে উন্নীত হওয়ার পরে আদালতে সাক্ষীর উপস্থিতি নিশ্চিতকরণে পুলিশ প্রশাসনের ব্যর্থতা। এর মধ্যে তদন্তকারী কর্মকর্তার অনুপস্থিতির হার সর্বাধিক। এর পরেই রয়েছে ফৌজদারি মামলায় জব্দকৃত আলামত প্রদর্শন করার জন্য অত্যাবশ্যক জব্দ তালিকার সাক্ষীদের অনুপিস্থিতি ও মেডিকেল অফিসারের অনুপস্থিতি। তাছাড়া কখনো কখনো অভিযোগের সমর্থনে অভিযোগকারীর সাক্ষ্য প্রদান করতে না আসার কারণেও ফৌজদারি মামলাসমূহ বিলম্বিত হয়। বিচার প্রক্রিয়া শেষ হতে যত সময় ক্ষেপন হতে থাকে, সাক্ষীর উপস্থিতির হারও কমতে থাকে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আইনগত বাধ্যবাধকতা থাকা সত্ত্বেও বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই সাক্ষীর উপস্থিতি নিশ্চিতকরণে আদালত হতে ইস্যুকৃত ওয়ারেন্ট যথাযথভাবে তামিল না হলে কিংবা তামিল করা অসম্ভব হলে সংশ্লিষ্ট থানা হতে সে সংক্রান্ত কোন প্রতিবেদন প্রায়শই ওয়ারেন্টে উল্লেখকৃত তারিখের পূর্বে আদালতে প্রেরণ করা হয় না। যার ফলে একই সাক্ষীর উপস্থিতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একাধিক ওয়ারেন্ট অকার্যকর অবস্থায় থানায় জমে থাকে, অথচ ঐ ওয়ারেন্ট কিংবা যে সাক্ষীর প্রতি ওয়ারেন্ট ইস্যু করা হয়েছে তার উপস্থিতির সম্ভাব্যতার বিষয়ে আদালত ওয়াকিবহাল থাকেন না।

সাক্ষীর উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য অনেক সময় পুলিশ সুপার কিংবা আইজিপি বরাবরে আদালত কর্তৃক আদেশের অনুলিপি বারংবার প্রেরণ করা হলেও দৃশ্যত: কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হয়নি।

সুপারিশ ঃ

ফৌজদারি মামলায় সাক্ষীর উপস্থিতি নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে পুলিশ প্রশাসনকে জবাবদিহিতার আওতায় নিয়ে আসতে হবে। এছাড়া, যে ওয়ারেন্ট সমূহ তামিল করা হয়নি তার তালিকা প্রতিমাসে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত প্রেরণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা জজ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৬। <u>The Negotiable Instrument Act, 1881 এর মামলাসমূহের বিচারিক এখতিয়ার পরিবর্তন ঃ</u>

The Negotiable Instrument Act, 1881 এর ১৪১ ধারায় দায়রা আদালতকে উক্ত আইনের ১৩৮ ধারায় দায়েরকৃত মামলা বিচার করার এখতিয়ার দেয়া হয়েছে। কিন্তু দেশের দায়রা আদালতসমূহ বিভিন্ন প্রকার দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার ভারে এমনিতেই ভারাক্রান্ত। উপরন্তু, ১৩৮ ধারার এ মামলাসমূহ অপেক্ষাকৃত সরল, বাঁধা ধরা নিয়মের অল্প সময়ে নিষ্পত্তিযোগ্য এবং এ ধারার অপারাধের জন্য বিদ্যমান শাস্তি সর্বোচ্চ ১ বছরের কারাদন্ড, অথবা সংশ্লিষ্ট চেকে বর্ণিত টাকার তিন গুন পর্যন্ত জরিমানা, অথবা উভয় প্রকার দন্ড। অন্যদিকে একজন জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের কারাদন্ড প্রদানের সাধারণ ক্ষমতা সর্বোচ্চ ৭ (সাত) বছর, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আরও বেশি।

সুপারিশ ঃ

উল্লেখ্য, প্রাথমিক পর্যায়ে The Negotiable Instrument Act, 1881 এর ১৩৮ ধারার অধীনে দায়েরকৃত মামলাসমূহ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচারযোগ্য ছিল, যা পরবর্তীতে সংশোধনের মাধ্যমে দায়রা জজের এখতিয়ারাধীন করা হয়। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে, এই সকল মামলাসমূহ বিচার করার ক্ষেত্রে দায়রা আদালতকে প্রদত্ত এখতিয়ার সংশোধনক্রমে পুনরায় জুডিসিয়াল বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটকে প্রদান করা হলে একদিকে দায়রা আদালতসমূহ কিছুটা ভারমুক্ত হয়ে অন্য জটিল মামলাসমূহ নিষ্পত্তি করতে যথেষ্ট সময় পাবে, বিচার প্রার্থী ও আসামীর ভোগান্তি লাঘব হবে। অন্যদিকে The Negotiable Instrument Act, 1881এর মামলাসমূহ দ্রুততম সময়ে নিষ্পত্তি হবে।

৭। <u>নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ এ বিদ্যমান সমস্যাবলীর সমাধান ঃ</u>

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ এ ভিকটিমের বয়স নির্ধারণ ও আসামীর জামিন শুনানীর ক্ষেত্রে বেশ কিছু জটিলতা বিদ্যমান রয়েছে। বর্তমান আইনে ভিকটিমের বয়স নির্ধারণের জন্য সংশ্লিষ্ট ট্রাইব্যুনালে প্রেরণ করতে হয়। অন্যদিকে জি আর মামলার ক্ষেত্রে এই আইনের অধীনে জামিনের দরখাস্তটি ম্যাজিস্ট্রেট নামঞ্জুর করলে সেক্ষেত্রে উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে দায়রা জজ আদালতে মিস কেস দায়ের করতে হয় এবং উক্ত শুনানী অন্তে নথি পুনরায় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ফেরত পাঠানো হয়, যা প্রকৃতপক্ষে সময়সাপেক্ষ ও জটিল একটি প্রক্রিয়া।

সুপারিশ ঃ

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ এর অধীনে কোন মামলা দায়ের করা হলে তা আমলে গ্রহণ করার আগ পর্যন্ত অর্থাৎ তদন্তকালে স্বাভাবিক নিয়মেই ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে থাকবে এবং তদন্তঅন্তে ম্যাজিস্ট্রেট তা বিচারের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট ট্রাইব্যুনালে প্রেরণ করবে। উল্লেখ্য, অন্যান্য দায়রা মামলায় এমনকি হত্যা মামলাতেও ম্যাজিস্ট্রেট জামিনসহ বিভিন্ন অর্ন্তবর্তীকালীন আদেশ প্রদান করে থাকেন। একইভাবে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর অধীনে দায়েরকৃত মামলার ক্ষেত্রেও তদন্ত চলাকালে ভিকটিমের বয়স নির্ধারণ এবং আসামীদের জামিনসহ যেকোন অর্ন্তবর্তীকালীন আবেদন শুনানীর জন্য ট্রাইব্যুনালে না পাঠিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট নিজেই তা শুনানীঅন্তে আদেশ প্রদান করতে অধিকারী হবেন মর্মে আইন সংশোধন করা প্রয়োজন। এর ফলে এই সকল অর্ন্তবর্তীকালীন আদেশ প্রদানের জন্য ট্রাইব্যুনালের যে অযথা বিলম্ব হয় তা দূর করা সম্ভব হবে।

৮। ফৌজদারী মামলায় আপোষ মীমাংসা প্রবর্তনের প্রস্তাব ঃ

বর্তমানে প্রচলিত ফৌজদারি মামলার বিচার ব্যবস্থায় বাধ্যতামূলক বা নির্দেশমূলক আপোষ মিমাংশা পদ্ধতি গ্রহণের তেমন কোন সুযোগ নেই। The Code of Criminal Procedure, 1898 এর ৩৪৫ ধারায় আপোষের বিধান থাকলেও তা পর্যাপ্ত নয়। আপোষ করার ক্ষেত্রে আদালত সরাসরি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেনা বা আদালতের জন্য তা বাধ্যতামূলক নয়। ৩৪৫ ধারা পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় আপোষের ক্ষেত্রে এই ধারাতে ব্যাপক সুযোগ প্রদান করা হয় নাই। ইহা ছাড়া ফৌজদারী মামলা অধিকাংশ জি, আর মামলা। জি, আর মামলার বাদী হন রাষ্ট্র যা সরাসরি থানায় দায়ের হয়। কিছু ক্ষেত্রে আদালতে দায়েরকৃত নালিশী দরখাস্ত ও জি, আর মামলায় রুপান্তরিত হয়; এসব মামলা রাষ্ট্রই বাদী হিসেবে গণ্য হন। ফলে এজাহারকারী মামলা প্রত্যাহার করতে আইনানুগভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত বা অধিকারী নন। এক্ষেত্রে মামলাগুলোর পক্ষগণ আদালতের বাইরে আপোষ করেন।

আপোষের ভিত্তিতে এমন ভাবে সাক্ষ্য প্রদান করা হয় যাতে আসামী খালাস পায়। অথচ সাক্ষ্য গ্রহণ, ফৌজদারী কার্যবিধি ৩৪২ পরীক্ষা, যুক্তিতর্ক অনুসরণ করে রায় দিতে হয় যাতে আদালতের মূল্যবান সময় নষ্ট হয় এবং আদালতে অহেতুক মামলার জট সৃষ্টি হয়। শুধু তাই নয়, ন্যায় বিচার এবং আইনের শাসনও অনেক ক্ষেত্রে ব্যাহত হয়। কারণ কেউ যদি গুরুতর ও ঘৃণ্য অপরাধ করে তাকে শাস্তি পেতেই হবে। সেখানে আপোষের সুযোগ নেই। যেহেতু মামলা বছরের পর বছর চলতে থাকে, বিচার প্রার্থী আদালতের চত্বরে বিচারের অপেক্ষায় থাকতে থাকতে একসময় নিরুপায় হয়ে পড়ে। এরূপ অসহনীয় অবস্থায় পড়েই বিচার প্রার্থীরা আসামীপক্ষের সাথে সমঝোতা করতে বাধ্য হয় যা শুধু অনৈতিকই নয়, আইনের শাসন ও সংবিধান পরিপন্থি।

সুপারিশ ঃ

যে সকল ফৌজদারী অপরাধের সাজার পরিমাণ কম এবং যা সরাসরি রাষ্ট্রের সম্পত্তি ও অর্থ সংশ্লিষ্ট নয় এবং যেগুলো আপোষ নিষ্পত্তি হলে সমাজে কোন নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে না, সে মামলাসমূহ আপোষযোগ্য করে আইনে বিধান প্রবর্তন করা প্রয়োজন। The Negotiable Instrument Act, 1881 এর ১৩৮ ধারার দায়েরকৃত মামলা, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ এর অধীনে কতিপয় ধারার মামলাসহ কতিপয় লঘুদণ্ড সংক্রান্ত অপরাধের ক্ষেত্রে আপোষের বিধান প্রবর্তন করা যেতে পারে। তবে সেসকল ক্ষেত্রেও বিচারককে সজাগ থাকতে হবে যে অন্যায় ভাবে বিচার প্রার্থী ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত না করা হয়।

সুপ্রীম কোর্টের জন্য প্রযোজ্য ঃ

বিগত ২০০১ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত সময়ের পরিসংখ্যান অবলোকন করলে দেখা যাবে যে বিচারকের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মামলার সংখ্যাও সমানতালে বৃদ্ধি পেয়েছিল কিন্তু পরবর্তী বছরগুলোর পরিসংখ্যান পর্যালোচনায় দেখা যায় যে পূর্বের বছর গুলোর তুলনায় বিচারক সংখ্যার সাথে মামলার সংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা কমে এসেছে। ছক আকারে বিষয়টি উপস্থাপন করা হলো ঃ

বছর	বিচারপতির সংখ্যা	মামলার সংখ্যা
২০০১	৪৮	১৩৫৮৭৯

২০০২	৫৫	১৫৪১৬৮
২০০৩	৪৮	১৬৮৪৪৭
২০০৪	৫৪	১৮৪৮১১
২০০৫	৭২	২০৮৩৮৯
২০০৬	৭১	২৪০৪৮৩
২০০৭	৬৮	২৬২৩৪৫
২০০৮	৬৭	২৯৩৯০১
২০০৯	৭৮	৩২৫৫৭১
২০১০	৯৪	৩১৩৭৩৫
২০১১	৯৮	২৭৯৯২৩
২০১২	১০১	২৯৭৭৩১
২০১৩	৯৫	৩২৩৪৪৬
২০১৪	৯০	৩৬১০৩৮
২০১৫	৯৭	৩৯৪২২৫
২০১৬	৯৫	৪২৪৯৯৪
২০১৭	৮৯	৪৭৬৭৫০
২০১৮	৯৫	৫১৬৬৫২
২০১৯	১০০	৪৮৯০৬৮
২০২০	৯৭	৪৫২৯৬৩
২০২১	৯২	৫১২৫৭৬
২০২২	৯৭	৫১৬৬৭৪

সূত্রঃ বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের ২০২২ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন।

১৯৭২ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত সময়ের মামলা দায়ের ও নিষ্পত্তির পরিসংখ্যান ছক আকারে নিম্নে প্রকাশ করা হলো ঃ

2.2.3. Trend of disposal of cases from the year 1972 to 2014

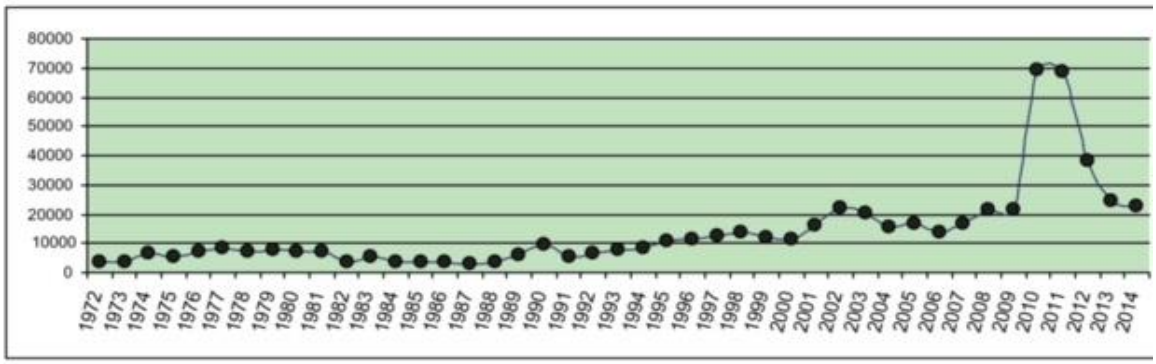

Figure 4: Line graph of disposal of cases from the year 1972 to 2014

১৯৭২ সাল থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত সময়ের মামলা দায়ের ও নিষ্পত্তির পরিসংখ্যান ছক আকারে নিম্নে প্রকাশ করা হলো ঃ

2.2.3. Trend of disposal of cases from the year 1972 to 2021

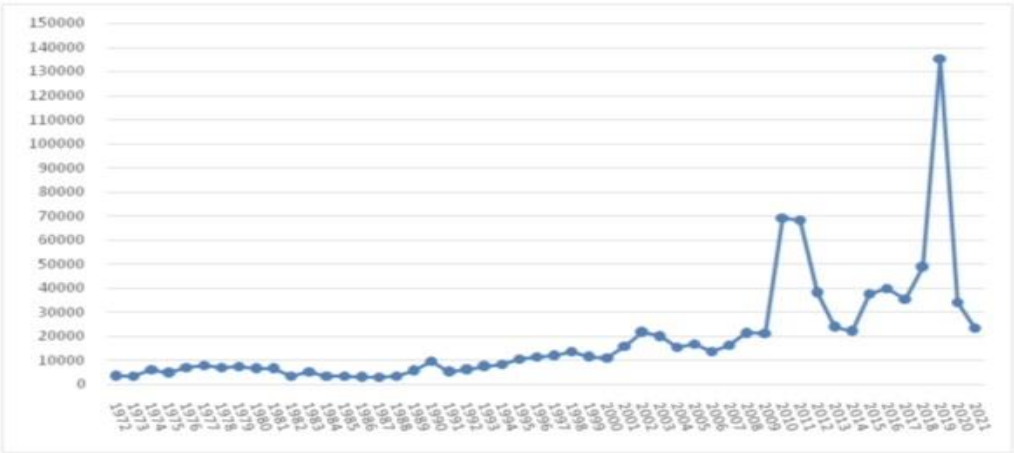

Figure 4: Line graph of disposal of cases from the year 1972 to 2021

উচ্চ আদালতে বিচারাধীন মামলার জট (Backlog) কমানোর লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ বিবেচনা করা যেতে পারেঃ

১। বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে একটি মনিটরিং সেল থাকবে যা প্রধানতঃ মামলা দাখিল ও নিষ্পত্তির সংখ্যা কি কি কারণে বৃদ্ধি পাচ্ছে তা নিরূপণ করে পদক্ষেপ নিবেন।

২। মাননীয় প্রধান বিচারপতি হাইকোর্ট বিভাগের সকল বেঞ্চের নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা মনিটর করবেন। কোন বেঞ্চের নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা কম হলে মাননীয় প্রধান বিচারপতি সংশ্লিষ্ট বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিবেন যাতে মামলা নিষ্জত্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

৩। কোন দেওয়ানী, ফৌজদারী মোশন দরখাস্ত বা সি,আর,পি,সি এর ৫৬১ এ ধারামতে দরখাস্ত (Motion) দাখিল করলে মাননীয় বিচারপতি মহোদয় প্রথমেই সময় নিয়ে উহার মেরিট যাচাই করবেন এবং মেরিটবিহীন দরখাস্ত হলে অবশ্যই সরাসরি খারিজ করবেন। এ ব্যাপারে মাননীয় প্রধান বিচারপতিকে সার্বক্ষণিক প্রত্যেকটি বেঞ্চের মামলা নিষ্পত্তির বিষয় অত্যন্ত কঠোর হস্তে মনিটর করতে হবে। ইহার কোন বিকল্প নাই। বর্তমানে summary disposal প্রায় বন্ধই হয়ে গেছে, তা পুনরায় চালু করার জন্য মাননীয় প্রধান বিচারপতি মহোদয়কে সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে, অন্যথায় মেরিট বিহীন মামলার সংখ্যা ক্রমাগত আকাশচুম্বী হবে এবং নতুন বিচারক নিয়োগ করলেও মামলার সংখ্যা কমবে না।

৪। মামলায় বহুক্ষণ যুক্তিতর্ক করে পরবর্তীতে শুনানী না করা (not pressed) এর সংস্কৃতি থেকে বের হয়ে আসতে হবে।

৫। প্রত্যেকটি মোশান এফিডেভিট এর তারিখ ও ক্রমানুসারে নিস্পত্তি করা প্রয়াজন। এতে বেঞ্চ অফিসারদের দৌরাত্ম্যের হাত থেকে আবেদনকারীগণ রেহাই পেতে পারেন।

৬। মামলা নিষ্পত্তির উপর জোর তাগিদ দিতে হবে। যে বেঞ্চ রুল ইস্যু করেন মাননীয় প্রধান বিচারপতি উক্ত বেঞ্চকেই ইস্যুকৃত রুলগুলোর শুনানী অন্তে নিষ্পত্তির নির্দেশ প্রদান করা বাঞ্চনীয়।

৭। যদি প্রকৃত আইনগত কোন কারণ ছাড়াই রুল ইস্যু করা হয়েছে বলে মাননীয় প্রধান বিচারপতির নিকট প্রতিয়মান হয় তা হলে ঐ সকল মাননীয় বিচারপতিগণকে Motion Power প্রদান না করাই সঙ্গত।

৮। অতীতে রুল ইস্যু করে ৬ সপ্তাহের মধ্যে ফেরত অন্তে তা যথারীতি কার্যতালিকায় চলে আসত, বর্তমানে তার ব্যত্যয় ঘটছে। এ ক্ষেত্রে রুল ফেরত আসার পরে তা নিয়মিত কার্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে দ্রুততম সময়ের মধ্যে উক্ত রুল নিস্পত্তি করতে হবে।

৯। হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক রুল জারী করার ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে তা নিস্পত্তি না হলে উক্ত রুল স্বয়ংক্রিয়ভাবে খারিজ হবার বিধান প্রণয়ন করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। বিষয়টি মাননীয় প্রধান বিচারপতি তাঁর Practice Direction এর ক্ষমতাবলে নিশ্চিত করতে পারেন।

১০। সুপ্রীম কোর্টের বিচারাধীন মামলার জট কমানোর লক্ষ্যে মাননীয় প্রধান বিচারপতি মহোদয় অন্যান্য সিনিয়র বিচারপতিদের সঙ্গে বৈঠক করে উপায় উদ্ভাবন করতে পারেন। তাছাড়া, অবকাশ কালীন বেঞ্চের সংখ্যা বৃদ্ধি করে Backlog কমানোর পদক্ষেপ নিতে পারেন।

১১। নিম্ন আদালতের কোন বিচারাধীন মামলার কার্যক্রম অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত করলে অনিবার্যভাবে নিম্ন আদালত, উচ্চ আদালত ও উভয় আদালতেই মামলার Backlog সৃষ্টি হয়। তাছাড়া, কোন ফৌজদারী মামলার তদন্ত কাজ স্থগিত করা বাঞ্ছনীয় নয়। এ ব্যাপারে বিচারকগণকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

১২। সুপ্রীম কোর্টের কোন বেঞ্চের আদেশের অনুলিপি নিম্ন আদালতে প্রেরণের নির্দেশ থাকলে সংশ্লিষ্ট সেকশন তা পাঠালো কি না তা যাচাই করা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের দায়িত্ব। এ ধরণের বিলম্ব মামলার জট সৃষ্টির অন্যতম প্রধান কারণ। নিম্ন আদালত হতে উচ্চ আদালতে রেকর্ড প্রেরণ এবং উচ্চ আদালত হতে আদেশের অনুলিপি বা রেকর্ডপত্র সময়মত নিম্ন আদালতে তড়িৎ প্রেরণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। কোন অবহেলা পরিলক্ষিত হলে কঠোর প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

১৩। সমগ্র বিশ্বে সকল আদালতে খরচা (Cost) আরোপ এর বিধান রয়েছে। সুপ্রীম কোর্টের উভয় বিভাগে কোন তুচ্ছ (Frivolous) বিষয়ে মামলা দায়ের হলে খরচা আরোপ করা বিশেষ প্রয়োজন। অন্যথায়, কখনই Meritless বিষয়ে মোশন বা লিভ আবেদনপত্র বন্ধ হবে না।

১৪। সুপ্রীম কোর্টের আদেশের অনুলিপি ও রেকর্ড নিম্ন আদালতে দ্রুত প্রেরণ নিশ্চিত করা।

১৫। উচ্চ আদালতে কিছু ক্ষেত্রে মামলার ক্যাটাগরী দৃষ্টে সুনির্দিষ্টভাবে মামলার প্রকৃতি উদঘাটন করা সম্ভব হয়না বিধায় মামলা নিষ্পত্তিতে নানাবিধ প্রতিবন্ধকতা তৈরী হয়। ফলে উচ্চ আদালতের মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির স্বার্থে রুল মামলাসমূহ 'আর (R)', রিভিশন মামলাসমূহ ' সি/আর (CR) ', আপীল মামলাসমূহ ' সি/এ (CA) ' নামে নামকরণ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে আদেশের বিরুদ্ধে আনীত রিভিশন মামলাসমূহ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দ্রুত সময়ে নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। উদাহরণ স্বরুপ বলা যেতে পারে রাষ্ট্র বনাম মিসেস হেলেনা পাশা ও অন্যান্য (ড্রাগ কেস নং ৪/১৯৯৩) (Paracetamol Case) কেসে হাইকোর্ট বিভাগে সাধারণ একটি আদেশ হতে ১৪ বছর সময় ক্ষেপণ হয়েছিল। এ ধরণের অবিচারের যেনো পুনরাবৃত্তি না ঘটে এ বিষয়ে সুপ্রীম কোর্টকে কার্যকর ও সময়যোপযোগি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

১৬। আগাম জামিন বিষয়ে বিচারপ্রার্থী জনগণকে অনেক সময় হয়রানির শিকার হতে হয়। আগাম জামিনের বিধান The Code of Criminal Procedure এ নেই। তবুও সুপ্রীম কোর্ট rarest of rare case এর ক্ষেত্রে আগাম জামিন দিতে পারেন। তবে এ ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। ২০১০/১১ সালে আগাম জামিন প্রদানের সংস্কৃতি বহুলাংশে বন্ধ করা হয়েছিল এবং ইতিবাচক পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল।

১৭। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মামলা ব্যতিরেকে মাননীয় প্রধান বিচারপতিকে সুপ্রীম কোর্ট ও জেলা আদালতের প্রশাসনের দিকে বেশী নজর দেওয়া প্রয়োজন।

এই ডিজিটাল বাংলাদেশে আইনের শাসন (Rule of Law) সমুন্নত রাখতে মামলা জট নিরসনে কার্যকর ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে না পারলে বিচার ব্যবস্থার উপর সাধারণ মানুষের আস্থা হারিয়ে যাবে। উপরি-উল্লিখিত কারণগুলো বাংলাদেশের সকল দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত তথা সামগ্রিক বিচার ব্যবস্থায় দীর্ঘসূত্রিতায় সমন্বিত ভূমিকা রেখে চলেছে। আইন কমিশন মনে করে মামলা জট নিরসনের ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নভাবে এক বা একাধিক সমস্যা ও তার প্রতিকারের প্রতি নজর না দিয়ে সামগ্রিকভাবে গঠনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ অত্যাবশ্যক।

স্বাক্ষরিত/

বিচারপতি এ.টি.এম. ফজলে কবীর
সদস্য

স্বাক্ষরিত/

বিচারপতি আবু বকর সিদ্দিকী
সদস্য

স্বাক্ষরিত/

বিচারপতি এ.বি.এম.খায়রুল হক
চেয়ারম্যান

২৮.০৮.২০২৩ খ্রিস্টাব্দ